বাংলা ভাষার সংস্কার

বাংলাভাষা শিখিবার ও শিখাইবার

নূতন মত ও সহজ পথ

বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধিকামী

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির শুভাশীষ সম্বলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত)

আবুল হাসানাৎ

প্রকাশক :
দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, বি,
ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
(পরিবর্দ্ধিত)
জুন, ১৯৪৪

প্রিণ্টার :
শ্রীঅনন্তকুমার বসু
আর্ট প্রেস, খুলনা।

বাংলার গণ্যমান্য নেতা ও সাহিত্যরথীদের শুভাশীষ

(যেমন যেমন পাওয়া গিয়াছে)

শ্রীযুক্ত **রাজশেখর বসু :** আবুল হাসানাৎ সাহেবের লিখিত বাংলা বানান সংস্কারের প্রস্তাব বাঙালী মাত্রের সযত্নে বিবেচ্য। সব মতেরই স্বপক্ষে আর বিপক্ষে যুক্তি আছে। আমার ধারণা, হঠাৎ আমূল সংস্কার অসম্ভব, একটি সুচিন্তিত ভবিষ্যৎ আদর্শ লক্ষ্য করে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করা উচিত। তথাপি মনে করি হাসানাৎ সাহেব ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন, যদিও কোনও কোনও বিষয়ে আমার মত একটু অন্যরকম। প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণের যে খসড়া তিনি খাড়া করেছেন তা অতি উত্তম।

স্যার **এ, এফ, রহমান :** আপনার বইখানি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়াছি এবং আমি বিশেষভাবে আপনার মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছি। আপনার প্রস্তাবগুলি স্বকীয় তাৎপর্য্যেই সবিশেষ চিন্তনীয় বিষয়। আপনার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীযুক্ত **বিনয়কুমার সরকার :** আবুল হাসানাৎ ইত্যাদি বাংলা সংস্কারকেরা একটা বড় কাজে হাত দিয়াছেন। সকলকেই সেলাম জানাইতেছি।

অনেক ভাষায়ই বানানের খামখেয়ালী মালুম হয়। ব্যাকরণের অবিচারও হামেশা নজরে পড়ে। অন্যান্য ভাষা মেরামত করিবার জন্য মিস্ত্রীরা বহাল আছে অনেক দিন ধরিয়া। বাঙালী বাচ্চারা বাংলা ভাষার মেরামতে মোতায়েন থাকিবে না কেন? আন্দোলন সুরু হইয়াছে ও পুষ্ট হইতেছে, সুখের কথা।

কবি **কাদের নওয়াজ :** আপনার "বাংলা ভাষার সংস্কারের" প্রুফ পেলুম। যা দেখলুম ও বুঝলুম তাতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারচিনে। এসব বিষয়ের আলোচনার দরকার এখন যে যথেষ্টই রয়েচে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাই আপনার দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে দেখে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ব্যাকরণ ও বানান "বিভ্রাট" থেকে অন্ততঃ ছেলেরা যে কতকটা মুক্ত হতে পারবে, এটা কম সুখের কথা নয়। এক সময় যাকে

"Dry linguistic drill" বলতো সেই নীরস ব্যাকরণকে আপনার সরস করবার প্রচেষ্টা আমাদের কাছে "নবজ্যোতিষ্ক" আবিষ্কারের মতই সুখজনক ও গৌরবজনক বলেই মনে হচ্ছে। আপনার চেষ্টা সফল হোক, আপনার সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক।

সম্পাদক **আবুল কালাম শামসুদ্দীন**, সুসাহিত্যিক **আবুল মনসুর আহমদ** এবং সুলেখক কাজী **মোহাম্মদ ইদ্রিস**ঃ মিঃ আবুল হাসানাৎ সাহেবের "ভাষা সংস্কার" নামক পুস্তকটী গভীর মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। শিক্ষা ও সাহিত্যের খাতিরে বাঙলার ভাষা লিপির যে আমূল সংস্কার হওয়া দরকার সে বিষয়ে আবুল হাসানাৎ সাহেবের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। তিনি এই পুস্তকে যে সব সংস্কার প্রস্তাব করেছেন, প্রয়োজনের দিক থেকে আমরা সেগুলিকে যথেষ্ট মনে না করলেও এবং তার প্রস্তাবের কোন কোনটার সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত না হলেও মোটামুটি মিনিমাম সংস্কার হিসাবে তার প্রস্তাবগুলো আমরা সমর্থন করছি।

আমরা আশা করি শিক্ষা ও সাহিত্যের হিতৈষী মাত্রেই নিরপেক্ষ ভাবে এবং সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আবুল হাসানাৎ সাহেবের প্রস্তাব সমূহ আলোচনা করবেন।

'বুলবুলের' সম্পাদক সুসাহিত্যিক মুহম্মদ **হবিবুল্লাহ্** (বাহার): বাঙ্গলা বর্ণমালা ও ব্যাকরণের সংস্কারের জন্য আপনি যে আন্দোলন চালাইতেছেন তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে এই বিষয়ে আমি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। খুটিনাটি মতভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দেখা যাইতেছে মূল উদ্দেশ্য আমাদের একই। আজ আপনাকে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি। চারিদিকে জন-সাহিত্য ও জন-শিক্ষার রব উঠিয়াছে। এখানে সেখানে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনার কথাও শোনা যাইতেছে। ব্যাকরণ ও বর্ণমালার সংস্কার না হইলে জন শিক্ষার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা সহজ হইবে না।

অধ্যাপক **খগেন্দ্রনাথ মিত্র**ঃ আবুল হাসানাৎ সাহেব বাংলা ভাষার একজন অনুরাগী ভক্ত। ইহার উৎকর্ষ ও সংস্কার সাধনের জন্য তিনি অনেক দিন ধরিয়া বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। বাংলা ভাষার জটিলতা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে এই জটিলতা যে দুরতিক্রম্য একথাও সমস্ত

পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে এই জটিলতার অবসান ঘটিয়া বাংলা-ভাষা শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। আবুল হাসানাৎ সাহেবের মত এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যাকরণ-বিভীষিকা, বানান-সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বঙ্গভাষানুরাগীর চিন্তনীয় বিষয়। তাঁহার মত যে সর্বত্র অনুসরণ করিতে হইবে বা করা সম্ভব তাহা নাও হইতে পারে। তবে তিনি যে এই সকল বিষয় উত্থাপন করিয়া আলোচনার সুযোগ দিয়াছেন, এজন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি তাঁহার এই সাধু উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

চিন্তাশীল সাহিত্যিক **এস, ওয়াজেদ আলি**: আবুল হাসানাৎ সাহেবের বৈজ্ঞানিক মন আছে। তিনি তাঁর 'বাংলাভাষার সংস্কার' পুস্তকে অনেক প্রয়োজনীয় সমস্যার আলোচনা করেছেন, যাদের সমাধান বর্ত্তমান যুগে প্রয়োজনীয় বলেই আমার মনে হয়। সমস্যার আলোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন হননি। সমাধানের সুচিন্তিত উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করেছেন। যুক্তবর্ণের বিষয় তিনি যা বলেছেন তা বাংলার সুধী সমাজের গভীর চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয় হাসানাৎ সাহেবের প্রস্তাবগুলি নিয়ে দেশময় নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া উচিৎ। আপাতদৃষ্টিতে আমি তাঁর অনেক প্রস্তাবের সমর্থন ক'র, তবে এবিষয়ে চূড়ান্ত মত স্থির করবার অবসর আমি পাইনি।

অধ্যাপক **মনসুর উদ্দিন**, এম-এ,: আমাদের বাংলাভাষার পরিবর্ত্তন আনবার সময় হতে না হতেই এই যে আপনার অতিমানুষিক প্রচেষ্টা, এতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি আপনার সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

সুসাহিত্যিক **শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়**: আপনার প্রস্তাবিত "বাংলাভাষার সংস্কার" বিষয়টির জাতীয় দিক হইতে মূল্য আছে। আশা করি সকলেই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সুলেখক **রেজাউল করীম**, বি, এল: আপনার প্রেরিত 'বাঙ্গলাভাষার সংস্কার' পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। আমি একথা মর্ম্মে উপলব্ধি করি যে বাঙ্গলা ভাষাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষার পার্শ্বে স্থান লাভ করিতে হইলে ইহার কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতির আশু সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন। আপনি বাংলাভাষার সংস্কারে মনোযোগী হইয়া একটি মহৎ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কার ও সংশোধন অভাবে বাঙ্গলা ভাষা যুগের প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না।

বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণে বহু অবৈজ্ঞানিক বস্তু আছে। সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্কার করা খুবই দরকার। আপনার উদ্দেশ্য সফল হউক।

দেওয়ান মহম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ, এম-এল-এ (আসাম): প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বে 'সওগাত' নামক মাসিক পত্রিকায় "বাংলা বর্ণমালা সমস্যা" ও "বাংলা ব্যাকরণ সমস্যা" বলিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বহু বৎসর পরে আপনাকে এপথের হামরাহীরূপে পাইয়া আপনাকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

নবপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক **মোঃ ওয়াজেদ আলি**: আবুল হাসানাৎ সাহেব বাংলা বর্ণমালা, বানান ও ব্যাকরণের যে সংস্কার চেষ্টা শুরু করেছেন আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে যে এই ধরণের সংস্কার একান্ত এবং আশু প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে আজ আর কোথাও দ্বিমত নেই।...তাঁর উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক মন নিয়ে তিনি যে চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন, আমি তার সাফল্য কামনা করি।

কবি **গোলাম মোস্তফা**: আপনার "বাংলা-ভাষার সংস্কার" পড়িয়া এবং দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম। বাংলা ব্যাকরণ-বিভীষিকার বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযান শুরু করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে দেই আন্তরিক মোবারক-বাদ। কোন কোন স্থানে কোন কোন বিষয়ে আপনার সহিত আমার কিছুটা মতানৈক্য থাকিলেও, আপনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত।

সুসাহিত্যিক **মিঃ এস্‌, কে, হালদার**, আই-সি-এস: আপনার প্রস্তাবিত বানান-সংস্কার সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই আমার মত প্রকাশ করিয়াছি (৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাংলা বানানকে যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল করিবার আমিও একান্ত পক্ষপাতী।

সুসাহিত্যিক **মোজাম্মুর রহমান**: বাংলা ভাষার উন্‌নতি কামনায় জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের কোশেশ ও আন্‌তরিকতা মোবারকবাদের মোসতাহেক। বিষয়টী নেহায়েৎ দরকারী। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের সকল দরদীকে সংকীর্ণতা-মুক্ত মন নিয়ে এর আলোচনা করতে হবে। সংস্‌কারের আবশ্যকতা সমবন্‌ধে আমার মনে কোন সন্‌দেহ নাই। আলোচনার আলোকে নতুন, সহজ ও সুন্‌দর পথের সন্‌ধান লাভ হোক, কামনা করি।

কবি **মঈনুদ্দীন**: অস্ফুট-মস্তিষ্ক শিশুদের বুদ্ধিবিকাশের সাহায্য করা আমার কাজ। প্রচলিত-প্রথায় তাহাদিগকে বাঙলা বর্ণমালা শিখাইতে যে কী বেগ আমাকে পাইতে হয়, তাহা আমি জানি। স্কুল পাঠ্য বহি লিখিতে গিয়াও কম বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় নাই। এইজন্য আপনার এই পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করিতে আমার কুণ্ঠা নাই। তবে ইহা একার কাজ নহে এক যুগের কাজও নহে। আপনি ব্যাপক ভাবে ইহার সূচনা করিলেন মাত্র। এর ইতিহাসে আপনার একটা বিশিষ্ট স্থান থাকিবে। আপনার উৎসাহ, উদ্যম এবং অধ্যবসায়কে অন্তর হইতে অভিবাদন করিয়া আমার বক্তব্যের ইতি করিতেছি।

অধ্যাপক কাজী **মোতাহার হোসেন**, এম,এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: আপনার "বাংলা-ভাষার সংস্কার" পাঠ করে বড়ই আনন্দ লাভ করলাম। আজ-কালকার কর্ম্মব্যস্ত জীবনে অনাবশ্যকের বোঝা যত কমান যায় ততই মঙ্গল। অল্পবোধ বালক বালিকাদের উপর দুর্ব্বোধ ব্যাকরণের খুঁটিনাটি চালাতে যাওয়া অপরাধ। তাতে ওদের রসবোধ ব্যাহত হয়, শিক্ষার আনন্দ দূর হয় আর চিন্তাশক্তি অনবরত সঙ্কীর্ণ স্থানে অযথা ঘুরপাক খেতে খেতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। তাই এদিকে শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আপনি সমাজের এক কল্যাণজনক কাজ করেছেন। জনসমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা এবিষয় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই আপনার পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে।

বর্ণমালার অনাবশ্যক অক্ষর বাদ দেওয়া এবং বানান সংস্কার ও লিখন সৌকর্য্য সম্বন্ধেও আপনার অভিমত সুযুক্তিপূর্ণ। আপনার গভীর চিন্তা, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তিদ্বারা আরব্ধ কাজের রূপ দিতে পারলে শিশুশিক্ষা সহজ হবে, বাঙালীর 'মস্তিষ্কের অপচয়' অনেকটা নিবারিত হবে এবং বাংলাভাষা পৃথিবীর আধুনিক অভিজাত ভাষার মধ্যে উচ্চ পংক্তিতে স্থান পাবে। আপনার সংকল্প সাধু, উপায় যুক্তিসহ, আয়োজন আশাপ্রদ; এখন কর্ম্ম জয়যুক্ত হ'লেই সব প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সুলেখক **এস্, এম্, কিউ, জুলফিকার আলী** (নসরু): আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার এই অভিযানকে সমর্থন করি, কারণ আমার বিশ্বাস, আপনার প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়। এ সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু বলিবার অধিকার বা যোগ্যতা আছে, তাঁহাদের উচিত আপনার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা। পাঠক সমাজকে আপনার পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

কবি **নরেন্দ্র দেব**ঃ বাংলাভাষা ও বানান সমস্যা সমাধানের আমরা চিরদিনই পক্ষপাতী। আপনি যে সমস্ত পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য আবেদন করেছেন, ৫।৬ বছর আগে আমরা এর প্রায় সবগুলিই সমর্থন করেছি। বর্তমান যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ। 'টাইপ-রাইটার' ও 'লিনোটাইপ' যন্ত্রে বাংলাভাষা ব্যবহার করা না গেলে আমাদের সকল দিক দিয়ে পেছিয়ে পড়তে হবে। সুতরাং যুগোপযোগী ভাষার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। 'যুক্তাক্ষর' অচল। তিনটি 'শ' দুটি 'ন' দুটি 'জ' দুটি 'ই' ৎ, ঌ, ঋ প্রভৃতি বর্জনের আমরা সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। 'রবিবাসরের' একটি অধিবেশনে আপনার এই প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। সেখানে আমি আপনার মত জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলুম। আপনার এই শুভ প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

কবি **জুল্ফিকার হায়দার**ঃ আমি বাংলা অক্ষর সংস্কার চাই। আপনি এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন, আপনার এই শুভপ্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ'ক কামনা করি। বাংলা অক্ষর ও বানান সম্পর্কে সংস্কারের প্রয়োজন বাঙ্গালী সুধী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন বলে আমি আশা পোষণ করি।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিভাগের এসিষ্টান্ট ডাইরেক্টর ও খ্যাতনামা গ্রন্থকার **খানবাহাদুর আহ্ছানুল্লাহ্**ঃ বাংলা ভাষার সংস্কার উপলক্ষে আপনি যে সকল গভীর গবেষণা করিয়াছেন ও যাহার কিয়দংশ ইঙ্গিত আপনার প্রেরিত পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছি, তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সরকারী উচ্চ দায়িত্বের মধ্যে আপনি এত দক্ষতার সহিত সাহিত্য আলোচনার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাতে সমগ্র মোছলেম জাতি গৌরবান্বিত।

ব্যাকরণ ভাষাকে অনুসরণ করিবে, সুতরাং তাহাকে সরল করিতে হইলে ব্যাকরণের উৎপীড়ণকে লঘুকৃত করিতে হইবে।

দুর্ব্বোধ্য সন্ধি ও সমাসের আতঙ্ক হইতে শিশুদিগকে বাঁচাইতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ যেমন ভাষা সংস্কার অনুমোদন করিবেন, সেইরূপ ব্যাকরণ সংস্কারও চিন্তা করিতে হইবে। উদ্দেশ্য জটিলতার পরিহার, সরলতার সৃষ্টি—বর্ণে, শব্দে, বাক্যে ও ভাষার।

অধ্যাপক **হুমায়ুন কবির**ঃ বাঙলার বানান সংস্কার নিয়ে আপনি যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমি অনেকখানি একমত। আমার নিজের বিশ্বাস যে রোমান হরফের প্রচলন হওয়া সম্ভব ও উচিত, কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন

যদি আপনার প্রস্তাব অনুসারে সংস্কার কার্য্যকরী হয়, বাঙলা শিক্ষা ও লেখার অনেক সমস্যা কমে যাবে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা-সঙ্কোচ সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটুকু করতে পারলেও বাঙলার অগণিত শিক্ষার্থী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু সরকার অথবা অন্ততপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এসম্বন্ধে উদ্যোগী না হ'লে এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা কঠিন। আশা করি যে সে বিষয়েও আপনি চিন্তা করেছেন। আপনার প্রচেষ্টা ও সাহসের জন্য অভিনন্দন জানাই।

ঐতিহাসিক **এ. মওদুদ**, বি-সি-এস্: প্রত্যেক সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতীই অনুভব করেন যে বর্ত্তমান প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণ ও বানান পদ্ধতির সংস্কার অতি প্রয়োজনীয়, তবু কেন জানিনা, এপর্য্যন্ত কেহ এবিষয়ে অগ্রণী হতে সাহসী হননি। আপনিই এবিষয়ে আগুয়ান হয়ে সৎসাহসের পরিচয় দিলেন। আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আমি একমত। সত্যকথাটাকে সত্যিকার ভাবে বল্‌বার সৎসাহস আপনার আছে; আপনার উদ্যম ও প্রচেষ্টা সফলকাম হবেই।

সুসাহিত্যিক **আবুল ফজল** (চট্টগ্রাম কলেজ): আপনার 'বাংলাভাষার সংস্কার' প্রবন্ধ পেয়েছি, সাগ্রহে পড়েছি। আমাদের ভাষার বানানের জটিলতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণভাবেই ওয়াকিবহাল, এখনো হাতের কাছে অভিধান না নিয়ে কিছু লিখতে আমি ভরসা পাইনা। আমার বিশ্বাস, আমাদের ভাষা সংস্কারের চাবিকাঠি এখনো বিশ্ববিদ্যালয় ও Text Book Committeeর হাতেই রয়েছে, ওঁরা যতদিন অচল অটল হয়ে রইবেন ততদিন এই পথে সমস্তই পণ্ডশ্রম হ'তে বাধ্য। ধর্ম্ম প্রচারকের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা আপনার আছে, তাই প্রার্থনা করি অপরাজেয় সাধকের ভাগ্য আপনার হউক।

অধ্যাপক **শ্রীসুকুমার সেন**: আপনার "বাংলাভাষার সংস্কার" পড়িয়া দেখিলাম। আপনার উদ্যম প্রশংসনীয়। স্কুলপাঠ্য বাঙ্গলা ব্যাকরণের সংস্কার হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। আপনার উদ্যমকে অভিনন্দিত করিতেছি।

অধ্যাপক কাজী **আকরম হোসেন**: বাংলা বানান ও ব্যাকরণের জটিলতার বিরুদ্ধে আপনার এ অভিযানের জন্য আপনাকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

সুপ্রচারক **সৈয়দ আসাদউদ্দোলা শিরাজী**: মানুষের চিন্তাধারার গতি যদি শেষ না হয়, তবে তার বর্জ্জন ও গ্রহণ সীমাবদ্ধ নয়। এই দিক দিয়া মানুষের সমস্ত কিছুই সংস্কারসাপেক্ষ।

বাংলাভাষার শব্দসম্পদ নানা ভাষার শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য্য ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিন ঘানিতে পিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। এই অহেতুক

বেড়াজাল হইতে ভাষাকে যাঁহারা সরল ও সহজ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, আপনি শক্তি ও সাহসের সহিত তাঁহাদের অনুসারী হয়েছেন সেজন্য মোবারকবাদ জানাইতেছি।

গৌড়বংগ সাহিত্যপরিষদের সভাপতি **এ, কে, এস্, নুরমহম্মদ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্ন, সাহিত্যভূষণ, ভাষাতত্ত্বনিধি, অনুসন্ধানবিশারদ:** আজকের দিনে প্রাচীন রাষ্ট্রের প্রতি, সভ্যতার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, একটা বিতৃষ্ণা, একটা অনাস্থার প্রলেপ দেখিতেছি। এককথায় চিরাচরিত প্রথার প্রতি একটা অবিশ্বাস দেখা দিয়াছে। ঠিক এমনি দিনে আপনিও নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে বাংলাভাষা সংস্কারের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, ইহা সুখেরই বিষয়। মনীষী রবীন্দ্রনাথ হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত বাংলাভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যকে আরো সহজতর করিবার জন্য আমরা আরও অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলাম। আপনি সেই পথেরই অগ্রদূত। আমরা আপনার অসহায় অবস্থার বাধা ব্যবধানময় পথের সহযাত্রী। আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ, এফ, এম, আবদুল হক, এম-এ, ডিপ্-ইন্-এড (লীড্স), এম-আর-এস-টী (লণ্ডন), প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর: মি, আবুল হাসানাৎ কৃতী ও মশ্হুর লেখক। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কতগুলি জনপ্রিয় পুস্তক দেশবিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কারের জন্য তিনি যে সব বৈপ্লবিক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বিদ্যোৎসাহী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। বংলাভাষা সহজ ও সরল হইলে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীর পক্ষে বাংলা লেখা ও পড়া অল্প ক্লেশে আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে তাহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের পক্ষে সহজ যুক্তাক্ষরহীন বাংলা বিশেষ সহায়ক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুলেখক **মাহবুব-উল আলম:** যাঁরা ভাষা-সংস্কারের কথা বলেন, আমার মনে হয় তাঁরা মূল-সমস্যার একটা দিকের কথা বলেন। মূল সমস্যা: বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী লাভ। ইহার উপরই বর্তমান জগতে বাঙ্গালীর মুক্তি নির্ভর করে। সমস্যার চাপে ভাষার ভাঙ্গা-গড়া আপনা হইতেই চলিতেছে। আবুল হাসানাৎ সাহেব উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছেন মাত্র।

মুসলিম বাংলার অন্যতম কবি **কায়কোবাদ** সাহেব : আপনার "বাংলা ভাষার সংস্কার" পড়িয়া দেখিলাম। একথা আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, প্রস্তাবিত সংস্কারে কেবলমাত্র প্রথম শিক্ষার্থীরই অসুবিধাগুলি দূর হইবে এমন নহে, জনশিক্ষাবিস্তারে প্রচুর সহায়তা করিবে। আপনি ঠিক পথই ধরিয়াছেন। এতে বোঝা যাইবে যে বাংলাভাষার প্রাণ আছে, পৃথিবীর অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া ইহা চলিতে পারে। ছাপাখানা এবং টাইপরাইটিং যন্ত্রেরও কাজ সহজ হইবে। আপনার সাফল্য কামনা করি।

আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ : বাংলা সংস্কৃতের কন্যা। উহার কাঠামো মূলতঃ সংস্কৃতের। অন্ততঃ। উহার বার আনা শব্দ সংস্কৃতের বর্ত্তমান যুগ-গতির সঙ্গে তাল রাখিবার প্রয়োজনে তবু আমি ইহার সংস্কারের প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু মূলতথ্য মনে রাখিয়া উহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করিতে হইবে, ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মোঃ হাসানাৎ সাহেবের সাধু উদ্যমের আমি প্রশংসা করি।

প্রবীণ সাহিত্যিক **সৈয়দ এমদাদ আলী** : মিঃ আবুল হাসানাৎ সাহেবের উপাদেয় গ্রন্থ "বাংলাভাষার সংস্কার" আমি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নের ভিতরে কেহ বড় যাইতে চা'হে না। গ্রন্থকার বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার সম্বন্ধে বহু দিক দিয়া এই গ্রন্থে অতি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য যুক্তিসহ। সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় বর্ণকে বাংলা বর্ণমালায় স্থান দেওয়া হইয়াছে, উহার বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক। এগুলি রাখিয়া শিশুদের মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা নিতান্ত অন্যায়। বানান-সংস্কার ফনেটিক সিস্‌টেমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। উহার ফলে যুক্তাক্ষর হইতে শিশুরা যেমন মুক্তি পাইবে, বাংলা ভাষাও অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় হইতে সেইভাবে মুক্তিলাভ করিবে। নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে গেলে আপত্তি উঠা স্বাভাবিক, কিন্তু সে আপত্তি মোটেই বিচারসহ হইবে না। সকল নূতন কাজই প্রথমে কষ্টসাধ্য বিবেচিত হয় কিন্তু অভ্যাসের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা দূর হইয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রন্থকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

—(আরও বহু উৎসাহবাণী আসিতেছে এবং পরে সংযোজিত হইবে।)

সূচীপত্র

বাংলাভাষার সংস্কার

— ১ —

নিবেদনের গোড়ার কথা

আমি বাঙ্গালী। বাংলাভাষায় কয়েকখানা পুস্তক লিখিয়া সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকা, সংবাদপত্র ও পত্রিকা, দেশের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং সাহিত্যিকেরা আমার উদ্যমে আমাকে প্রভূত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমার দ্বিতীয় পুস্তক "সচিত্র যৌনবিজ্ঞান" ১৯৩৬ সনে ভারত-বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম্-বি, ডি-এস্-সি, মহোদয়ের আশীর্ব্বাদজ্ঞাপক ভূমিকা-সম্বলিত হইয়া বাহির হয়। ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম:

"এই গ্রন্থের একটী ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ও

সঙ্কল্প আছে। তাহার উপকরণও যোগাড় হইয়া আছে। তথাপি দুইটী কারণে আমি **বাংলা সংস্করণ** আগে প্রকাশ করিলাম। প্রথম কারণ এই যে, আমাদের তরুণ-শিক্ষার্থিগণকে **মাতৃভাষায় সকল প্রকার শিক্ষা** দেওয়ার দাবী আজ সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিবার মত **পারিভাষিক শব্দ বিদ্যমান নাই** বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি **মনীষিগণের সাধু প্রচেষ্টা** আমাকে বহুলাংশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যদিও আমাকে অল্পবিস্তর শব্দ তৈয়ার করিতে হইয়াছে, তথাপি আমি গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে, **জটিল বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক** ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের অভাব আমি **আমার মাতৃভাষায়** খুব বেশী অনুভব করি নাই। **পারিভাষিক শব্দের অভাবে** আমাদের **মাতৃভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নে উপযোগিতায়** যাঁহারা সন্দিহান, আশা করি শীঘ্রই তাঁহাদের সন্দেহের অবসান হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষাপীঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বাংলার মনীষী স্যার আশুতোষের **স্বপ্ন সফল হইতে আর বেশী বাকী নাই**। বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ ও **সাহিত্যসেবীদের চেষ্টার ফলে** তাঁহার সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে।”

আমার যৌনবিজ্ঞান আলোচনায় শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদির পারিভাষিক শব্দ প্রচুর পরিমাণেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি **সংগৃহীত**; অনেকগুলি আবার

সংগঠিত। মোটের উপর, আমাকে বক্তব্যে **সঙ্কোচ** বা **আড়ষ্টভাব** বোধ করিতে হয় নাই।

ইংরেজী ভাষায়ও জটিল বিষয়বস্তু সম্বলিত আমার দুইখানি বই **এদেশ ও ওদেশে** প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। তবুও আমি সন্তুষ্টচিত্তেই বলিতে পারি যে, বাংলায় তদধিক কঠিন বিষয়বস্তুর আলোচনা বা ব্যাখ্যা করিতে আমার এতটুকুও অধিক **কষ্ট** বা **শ্রম** হয় নাই।

বলা বাহুল্য, সুবিখ্যাত 'চলন্তিকা' অভিধানে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয় পারিভাষিক শব্দের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা যেমন উপযোগী তেমনই গ্রহণযোগ্য। এতদিনে বিভিন্ন লেখকের প্রচেষ্টায় আরও অনেক শব্দ গঠিত হইয়া থাকিবে।

বাংলা ভাষার **ক্রমবর্দ্ধমান শব্দপ্রাচুর্য্য** ও **ভাবের সকল ধারা প্রকাশ করিবার মত উপযোগিতা** প্রতীয়মান হইবে উহার **গদ্য** ও **পদ্য**, **কাহিনী** ও **কাব্য**, **নাটক** ও **উপন্যাস**, **প্রবন্ধ** ও **গল্পের** ঐশ্বর্য্য দেখিলে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুমধুর কাব্যগুঞ্জনে, অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সুললিত রচনাভঙ্গীতে, নজরুল ইসলামের উদ্দীপনাঝঙ্কারে বাংলা ভাষার পূর্ণ উপযুক্ততা সুপ্রমাণিত।

কিন্তু কয়েকটী সমস্যা পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে।

এই সমস্যা অল্পবিস্তর পৃথিবীর **আদি**, **আধুনিক** সকল ভাষায়ই রহিয়াছে। আরবী, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক—ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাষায় **ব্যাকরণ সমস্যা** আরও উৎকটভাবে বিরাজমান।

আরবী ভাষা আয়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা পাঠ্যাবস্থায় আমার

খুবই শ্রমসাধ্য বোধ হইয়াছিল। অথচ এই আরবী ভাষারই সুললিত কাব্যঝঙ্কার যে প্রাণে কতটা উদ্দীপনা আনিত, ঐ ভাষায় অবতীর্ণ কোরাণ পাঠে যে অপূর্ব্ব ভক্তি ও ভাবের সঞ্চার হয় তাহার স্মৃতিও মধুর। সংস্কৃত সাহিত্যে গীতা, মহাভারত, কালিদাসের শকুন্তলা ইত্যাদি রচনা তেমনই উন্নত ও সুবিন্যস্ত।

ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, বাহন যতই জটিল হউক না কেন, প্রতিভার কাছে বাধা, বিপত্তি, জড়তা, জটিলতা কিছুই নহে। তেমনই **মেধাবী** বা **অধ্যবসায়ী** শিক্ষার্থী শ্রেণীবিশেষের পক্ষেও উহা ততটা দুরায়ত্ত নাও মনে হইতে পারে।

কিন্তু মুশ্‌কিল হইয়াছে, আধুনিক শিক্ষার্থীগুলের সম্প্রসারণ হওয়ায়। অর্থাৎ আজকাল **শিক্ষার সংস্পর্শলাভে সকলেই সমান অধিকারী** এই মূলসূত্র গৃহীত হওয়ায় এখন আর বিদ্যালাভ শুধু শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া অধিকার নহে। **ধনী, দরিদ্র, মেধাবী, অল্পবুদ্ধি** এবং **জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জনসাধারণ** ও **মানবশিশু শিক্ষার আলোকের** প্রত্যাশা করে এবং করিবেই। তাই **বানান এবং ব্যাকরণ বিভ্রাট** উৎকট সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

অমন যে বিশ্বব্যাপ্ত বহুলপ্রচলিত ইংরেজী ভাষা উহাতেও **বানানবিভ্রাট বিদ্যমান রহিয়াছে।** একই 'a' অক্ষরটার man, mane, mast, mare ইত্যাদি শব্দে **উচ্চারণ-বিকৃতি** বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। ইহার উপরে calm, though, psalm ইত্যাদিতে **অনুচ্চারিত অক্ষর বিন্যাসেরও** অভাব নাই। কোমলমতি

শিশুদের বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে যে ঐরূপ **উচ্চারণ-বিকৃতি** বা **অনুচ্চারিত অক্ষর-বিন্যাস** কতটা হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হয়, তাহা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের স্পষ্ট অনুমিত হইবে।

ইংরেজীভাষার **সংস্কার-প্রচেষ্টা** চলিতেছে। আমেরিকায় বানানসমস্যার সমাধান করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও সঙ্কল্প দেখা যাইতেছে। এমন কি, বিলাতেও সহজবোধ্য Basic Englishএর প্রচলনপ্রচেষ্টায় বহু লোক আগ্রহশীল।

বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও যে বিলাতে Basic English প্রচলনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার অপূর্ব্ব আগ্রহ দেখা যাইতেছে এবং এজন্য একটী কমিটীও কাজে লাগিয়া গিয়াছে উহার পশ্চাতে রহিয়াছে যুদ্ধোত্তর জগতে ইংরেজী ভাষার বহুল প্রসার ও আন্তর্জ্জাতিক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠার আশা ও প্রয়াস। মাতৃভাষার সকল সন্তানের পক্ষেই এইরূপ আশা ও আকাঙ্খা স্বাভাবিক। কিন্তু বিদেশী বা ভিন্নভাষী লোকদের প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হইতেছে ভাষাকে সরল সহজ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরা; সরল সহজ হওয়া সত্ত্বেও যে উহাতে উন্নত ভাবপ্রকাশে কষ্টবোধ হয় না তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করা।

সারা জীবনই বাংলাভাষার সম্পদকে জগতের সম্মুখে উঠাইয়া ধরিবার আশা আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জগতের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু ছিটফোটা দুই একটী লোকের প্রতিভা সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন দেখা দেওয়া এক কথা, আর জনসাধারণকে ভিন্ন ভাষা শিখিবার জন্য আগ্রহশীল করা অন্য কথা।

ইহার জন্য দরকার হইবে ভাষার আড়ম্বর —, জটিলতা —, বিভ্রাট— ও আড়ষ্টতাশূন্যতা সর্ব্বসমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইবার ; উহার সকল ভাব প্রকাশ করিবার উপযোগিতা প্রদর্শন।

ভাবজগতের যুগপরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে তাই বাংলাভাষীদেরও চেষ্টা করিতে হইবে বাংলাভাষাকে সকল প্রকার কণ্টক মুক্ত করিয়া ভিতরের লোকদিগকে অনাবশ্যক শ্রম হইতে রেহাই দেওয়ার এবং বাহিরের লোকদিগকে এইরূপ সরলীকৃত অথচ সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করার।

ব্যাকরণবিভীষিকা এবং **বানানসমস্যা** যে বাংলাভাষায়ও উৎকটভাবে বিদ্যমান এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

হরফ্ সংস্কারের প্রয়োজন বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বোধ করা হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি নাকি সংস্কারের সূত্রপাত করেন। 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধর সেনও এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এদিকে মনোযোগী রহিয়াছেন।

ইহা ছাড়া সাময়িক পত্রিকায়, সাহিত্য সভায়, প্রবন্ধ ও আলোচনায় এ সম্বন্ধে বহু লোক মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের আবেদনেই বিশ্ববিদ্যালয় একটী কমিটি গঠন করিয়া সংস্কার প্রচেষ্টার সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। ফলে কতকটা সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

আমিও ইঁহাদেরই অনুগামী; আমারও আগ্রহ ঐ প্রচেষ্টাকে পূর্ণতাদান।

বানান সম্পর্কে 'চলন্তিকা' অভিধানের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন: "ই-ঈ, উ-ঊ, ং-ঙ, জ য, ত-ৎ, ণ-ন, শ-ষ-স প্রভৃতি বর্ণ লইয়া বিভ্রাট হয়।"

আমরাও এই অভিমতের পূর্ণ পরিপোষক। শুধু বিভ্রাট হয় বলিলে অল্পোক্তি হয়; **মস্তিষ্কের উপর রীতিমত অত্যাচার** হয়। কয়েকখানা বহি লিখিবার পরেও আমাকে যে বারে বারে অভিধান খুলিতে বাধ্য হইতে হয় ইহা অপেক্ষা বিরক্তিকর আর কি হইতে পারে? ইহা হইতেই অনুমিত হইবে, শিশুদের বানানশিক্ষা কত প্রমাদজনক। বস্তুতঃ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ঐ **সঙ্কটময় পরিস্থিতির** কথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ইহা ছাড়া ছাপাখানা সংক্রান্ত বাধাবিপত্তি, ব্যয়বাহুল্য, সময়নাশ ইত্যাদির কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, সমস্যা কত বড়, বিড়ম্বনা কত অধিক।

রেমিংটন টাইপরাইটার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অতি কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বাংলা টাইপরাইটার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুঃখ করিয়া আমাকে লিখিয়াছেন যে, চারি বৎসর হইল তাঁহারা ঐ যন্ত্র বাজার হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, উহার চাহিদা একেবারেই নাই বলিলেই চলে।

অথচ ইহার কারণ প্রচলিত মতে ঐ যন্ত্রের জটিলতা। অক্ষরবাহুল্য, যুক্তাক্ষরবিভ্রাট, রূপান্তরবৈচিত্র্য ইত্যাদি টাইপ-রাইটারকে একেবারেই অচল করিয়া তুলিতে চায়।

বাংলাভাষাকে ভারমুক্ত করিবার জন্যই আমি গত ২রা আশ্বিন (১৩৫০) তারিখে আমার কতকগুলি প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি এবং বাংলার খ্যাতনামা সম্পাদক, প্রতিষ্ঠান, সাহিত্যিক প্রভৃতির কাছে নিম্নের নিবেদনটীসহ পাঠাই:

"আবুল হাসানাৎ

পুলিশ সাহেবের কুঠি, খুলনা

মাননীয় সম্পাদক,
মাননীয় সাহিত্যিক,
মাননীয় বন্ধু,

এতৎসঙ্গে **"বাংলাভাষার সংস্কার"** প্রবন্ধটী পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া এ সম্বন্ধে যত শীঘ্র পারেন আপনার (সকলেরই) **ব্যক্তিগত মতামত** জানাইয়া ও **সৎপরামর্শ** দিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার (সম্পাদকের) বহু প্রচলিত সংবাদপত্র বা পত্রিকায় প্রবন্ধটী **প্রকাশ করিয়া** পাঠক-পাঠিকার **সমালোচনা আহ্বান** করিলে আপনার মধ্যস্থতায় দেশবাসীর মতামত ও পরামর্শ পাইতে পারিতাম। অনেকেই আমাকে এই ভাবে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ছাপা হইলে **এই সংক্রান্ত আলোচনার সংখ্যাগুলি** আমাকে দয়া করিয়া পাঠাইলে মতামত বিচারে ভারী সুবিধা হইবে।

যদি সম্ভব হয় এবং আপনি আমার সহিত মোটামুটিভাবে একমত হন, তাহা হইলে ভাবী **জনমতঝটিকায়** আমার **সহায়, বন্ধু** ও **পৃষ্ঠপোষক** হিসাবে আপনার **সমর্থন-জ্ঞাপক** অভিমত মনোমত কোনও (সম্পাদকের বেলায় নিজের) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া

বাধিত করুন। **স্বপক্ষে** ও **বিপক্ষে** মতামত বিচার করিতে আমাকে **সমর্থনকারী** এবং **বিরোধী** গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোভাব জানিতেই হইবে। দরকার হইলে উঁহাদের তালিকাও (অবশ্য সম্মতিক্রমে) প্রকাশ করা হইবে।

ক্লাব / লাইব্রেরী / সমিতি / পরিষদের সম্পাদকেরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া প্রবন্ধ **পাঠ** ও **সমালোচনা** করিলে অনুগৃহীত হইব। করিলে, উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সভ্যগণের **সমালোচনার** সারমর্ম্ম জানাইলে উপকৃত হইব।

বিষয়টী গুরু। দেশবাসীর মতামত আমার জানা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম।

আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বিনীত

আবুল হাসানাৎ"

এই প্রচেষ্টার ফলে বহু পত্রিকা আমার প্রস্তাবগুলি প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন, বহু লেখক আমার আনুকূল্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, বহু সাহিত্যসেবী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কয়েক জায়গায় আলোচনাসভাও হইয়া গিয়াছে।

অনেকে এখনও ঐরূপ সহায়তা করিতেছেন এবং করিয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কয়েকখানা পত্রিকা আমারই প্রস্তাবিত বানান অবলম্বন করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, কেহ কেহ এখনও উত্তর দিবার সময় করিয়া

উঠিতে পারেন নাই বা এ বিষয়ে মতামত অব্যক্ত রাখাই উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। কেহ কেহ সামান্য আপত্তিও উত্থাপন করিয়াছেন।

উপস্থিত পুস্তিকায় পূর্ব্বের প্রস্তাবগুলিই আরও পরিবর্দ্ধন করিয়া, আরও কতগুলি সমস্যার সমাধান যোজনা করিয়া এবং উত্থাপিত আপত্তি সমূহ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজের সম্মুখে আবার নিবেদন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

সুখের বিষয়, যে **বিরুদ্ধ জনমতঝটিকার** ভয় করিয়াছিলাম তাহা এখনও উঠে নাই ; তবে এখনও যে উঠিতে পারে না এমন দাবী করিবার দুঃসাহসও আমার নাই।

বর্ত্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' (পৌষ—১৩৫০) হরফ-সংস্কার প্রসঙ্গে যে জোরালো মন্তব্য * করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, আমার সংস্কার-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী কেহই দণ্ডায়মান হইবেন

* "পৌষের 'ভারতবর্ষে' গংগা, সংগা, সংগে, উলংগ ইত্যাদি রূপ দেখিয়া মনে হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ 'ঙ্গ' অক্ষরটিকে বর্জ্জন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত কি ব্যাকরণসঙ্গত, তাহার বিচার আমরা করিতে চাহি না, আমরা ছাপাখানার পক্ষ হইতে শুধু এইটুকু চাই যেন অনাবশ্যক যুক্তাক্ষরের অত্যাচারে আমরা পীড়িত না হই। বর্ত্তমানে এই হতভাগ্য দেশের অভিশপ্ত ভাষার ততোধিক দুর্ভাগা কম্পোজিটরগণ ঊর্দ্ধে, নিম্নে, বামে, দক্ষিণে চারিখানি কেসে সাড়ে ছয় শত প্রকারের বিভিন্ন অক্ষর লইয়া যে কিরূপ বিব্রত হইয়া বসিয়া থাকেন, ছাপাখানার সঙ্গে যাঁহাদের কারবার আছে তাঁহারাই জানেন। তিনটা স, দুইটা ন, দুইটা জ—এ সব তো পুরাতন যুক্তি, চিরনূতন এবং চিরপুরাতন যুক্তি হইতেছে যুক্তাক্ষর। শুধু ব্যঞ্জনযুক্ত ব্যঞ্জন নয়, স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনেরও কত বিচিত্র

না; তবে সহানুভূতিশীল পৃষ্ঠপোষকগণেরও এখানে ওখানে যে কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকিতে পারে সে কথা স্বতন্ত্র। আপত্তি উঠিলে তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব; না পারিলে নিজেরই মত সংশোধন করিয়া লইব এ আশ্বাস সকলকে দিয়া রাখিতেছি।

আমি আবার নিবেদন করি, **বানান ও ব্যাকরণ সমস্যার সমাধান** অসম্ভব ত নহেই, এমন কি **দুঃসাধ্যও নয়।** সাধারণ

রূপ। একই আকৃতির টানের যে কত বিভিন্ন উচ্চারণ—আমরা কি করিয়া যে বাংলা লেখাপড়া তালিম করিলাম তাহাই আশ্চর্য্য। সাধারণ একটা উ-কারের চিহ্ন গ, শ, র, স্ত প্রভৃতির সহিত সংলগ্ন হইতে গিয়া যে কিরূপ বহুরূপীর মত ব্যবহার করে, রূ, দ্ধ প্রভৃতি যুক্তাক্ষরে একই চিহ্ন যে কেন কখনও উ কখনও বা ধ হইয়া যান, ইহার মীমাংসা আজ স্বয়ং গণেশও করিতে পারিবেন না। অথচ চক্ষু বুজিয়া এই ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি। আমরা যদি সামান্য সংস্কারপ্রয়াসী হই, তাহা হইলে ছাপাখানার দিক দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইতে পারি; বর্ত্তমানে সাড়ে ছয় শতের স্থানে মোটমাট ১৫০।২০০ অক্ষরেই যে কাজ চলিয়া যাইতে পারে, এখন যেখানে দেড় মণ টাইপে এক ফর্ম্মা উঠে, সংস্কারের পর সেই দেড় মণ টাইপে যে পুরা দুই ফর্ম্মা উঠিতে পারে, টাইপরাইটার প্রবর্ত্তিত ও সুগম হইয়া যে আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের কাজ ও রচনার কাজ অনেক সহজসাধ্য হইতে পারে—এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইলে জাতিগতভাবে আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা চক্ষুপীড়ার অজুহাত দর্শাইয়া যুক্তিহীন পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, এই অজুহাত নিতান্তই ভিত্তিহীন; যাঁহারা বিনা দ্বিধায় এক ঘণ্টা অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একাধিক বিভিন্ন ফেসের ইংরেজী হরফে বিভিন্ন বই পড়িতে

জ্ঞান, তুলনামূলক পর্য্যবেক্ষণ, বিচারবিবেচনা সম্বলিত নির্ভীক সংস্কার প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা অনায়াসে মাতৃভাষার জটিলতা দূর করিতে পারিব। ইহা শুধু মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়া, অবজ্ঞা করি বলিয়া নহে।

আমার উদ্দেশ্য যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া নহে, সুযৌক্তিক প্রণালীপ্রবর্ত্তন; ভড়কাইয়া দেওয়া নহে, সরল, সুগম পথপ্রদর্শন।

বিন্দুমাত্র কষ্ট পান না তাঁহারা নূতন পদ্ধতিতে প্রণীত লাইনো বা মনোটাইপের মুদ্রিত রচনা পড়িতে কেন যে আপত্তি করেন জানি না। আমরা এই জটিলতা ও জঞ্জালের হাত হইতে মুক্তি চাই, অক্ষর-সংস্কার চাই * * *"

— ২ —

ব্যাকরণ বিভীষিকা

আলোচনার প্রসঙ্গ দেখিয়াই হয় ত অনেক পণ্ডিত, শিক্ষক বা গুরুজন রুখিয়া উঠিবেন। তাঁহাদের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিব, আমি **ব্যাকরণবধ কাব্যের** অবতারণা করিতেছি না; করিতেছি **ব্যাকরণবোধ** সুষ্ঠুভাবে কি করিয়া করা যায় তাহার বিচার-প্রসঙ্গের।

সুখের বিষয় এই যে, গুরু হইতে শিষ্যেরই সংখ্যাধিক্য। আমরা সকল শিষ্য এবং নবজাত ও অজাত অসংখ্য শিক্ষানবিশী ব্যাকরণের গুরুভার কোনও মতে লঘু করা গেলে যে রেহাই পাই এ কথা বলাই বাহুল্য।

ব্যাকরণের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের পুঞ্জীভূত আপত্তি বিদ্রোহানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে চায়। উহার **কঠিন নির্ম্মম শাসনই** ইহার প্রধান কারণ। আমার মতে, উহার কার্য্যবিধিকে **সুশাসনে** পরিণত ও প্রজাবর্গের ভয় ও ভীতিকে সামান্য চেষ্টায়ই **ভালবাসা** ও **ভক্তিতে** রূপান্তরিত করা যায়।

এ জন্য দরকার হইবে ব্যাকরণের ভক্ত অনুচরদের মনোভাবের ঔদার্য্য এবং শিক্ষানবিশীদের ব্যাকরণের মুল তত্ত্বকথা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করার।

উভয়দলই আমার নিবেদন একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বিচার করিবেন এই ভরসায়ই উপস্থিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে আমি ব্যাকরণে কখনও পাকা হইতে চেষ্টা করি নাই। ছাত্রজীবনে অতি কষ্টে ব্যাকরণের যতটুকু মুখস্থ করিয়াছিলাম তাহার বেশীর ভাগই পরে উবিয়া গিয়াছিল। তবে ইদানিং অর্থাৎ এই সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রাক্কালে আমাকে নূতন করিয়া ব্যাকরণ পড়িতে হইতেছে। শুধু বাংলা ব্যাকরণ নহে; নানাবিধ ভাষার ব্যাকরণের স্তূপের মধ্যে বসিয়াই আমাকে কাজ করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—আশা করি, আমার এই আলোচনা বাংলা ব্যাকরণের প্রতি কঠোর ও নির্ম্মম আক্রমণ বলিয়া মনে করা হইবে না। আমি সকল ভাষার ব্যাকরণবিভীষিকারই প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিতেছি। আমার বক্তব্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

বাংলাভাষার ইতিহাস প্রায় ১০০০ বৎসর দীর্ঘ অথচ প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় পর্ত্তুগীস পাদ্রী কর্তৃক ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে!

অথচ এই অল্পকাল মধ্যেই বাংলার ব্যাকরণপ্রণেতারা যে রকম জাল বুনিয়া চলিয়াছেন তাহাতে ভয় হয়, অচিরেই বাংলা ব্যাকরণও আরবী, সংস্কৃত ব্যাকরণের মত জঞ্জালে পরিণত হইবে।

মোট কথা, বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাঙ্গালার ব্যাকরণই

নাই। যে সকল ব্যাকরণ আছে তাহাতে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম, সমাসের ধারা, কৃৎ-তদ্ধিতের রকম, প্রত্যয়ের ভড়ং ইত্যাদিরই বাহুল্য। যেন ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া কোন্ ভাষার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাহাই গ্রন্থকারেরা ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজীতে ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে শব্দসম্ভার আসিয়াছে; ফারসী, উর্দ্দুতে আরবী শব্দের প্রাধান্য এত জাজ্বল্যমান; অথচ ইহাদের নিজস্ব ব্যাকরণ ল্যাটিন, আরবী ব্যাকরণের ধার ধারে না। অথচ আমরাই কেবল সংস্কৃতের ব্যাকরণ অনেকটা হুবহু টানিয়া আনিয়া জাল ফাঁদিতেছি।

আমরা ভাষাকে অপরের জন্য সহজ শিক্ষণীয় এবং নিজেদের জন্য সরল, সুগম করিতে চাই; তাই ব্যাকরণকেও জঞ্জালে পরিণত হইতে দিব না।

ভাষা এবং **ব্যাকরণের** মধ্যে **প্রকৃত সম্বন্ধ** কি তাহা ভাল মতে বুঝিয়া না লইলে এই আলোচনা কেবলমাত্র খেয়ালী বা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইবে। ভাষাতত্ত্বের বাদানুবাদের ভিতরে না গিয়া আমি কতগুলি সাধারণ কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য নিবেদন করিব।

ভাষা

ভাষা দ্বারা আমরা সাধারণতঃ উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মানুষের মনোভাব প্রকাশের ব্যবস্থা বুঝিয়া থাকি। লিখিত ভাষা ঐ সকল ধ্বনিরই সাঙ্কেতিক প্রতিধ্বনি মাত্র। বিভিন্ন দেশ, কাল ও সমাজে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

পৃথিবীতে অধুনা প্রচলিত ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা প্রায়

৮০০ — ৯০০ হইবে। এক ভারতবর্ষেই প্রচলিত নাকি ১৪৬টি।

এই ভাষা এবং উপভাষাগুলি কতগুলি শ্রেণীতে পড়ে; ইহাদের মধ্যে আবার পারস্পরিক যোগসূত্রও বিদ্যমান আছে।

কানে শুনিয়া শেখা হয় বলিয়া পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় ভাষা প্রভাবান্বিত হয়। বিক্ষিপ্ত স্বজাতির মধ্যে ভাষার সাঙ্কেতিক বাহনের মধ্যস্থতায় অর্থাৎ লিখনের সাহায্যে ভাববিনিময় চলিত; এখন অবশ্য গ্রামোফোন, টেলিফোন এবং রেডিওযোগে ও ঐরূপ ভাববিনিময় চলে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার ইংরেজীভাষী অধিবাসীরা ইংলণ্ডের সঙ্গে এইভাবে যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

পক্ষান্তরে, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিন্ন ভাষা শুনিতে শুনিতে বা পড়িতে পড়িতেও আমরা নিজেদের ভাষাকে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত করি।

জগতে বোধ হয় এমন ভাষাই নাই যাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ এইরূপভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই। অবশ্য দ্বীপবিশেষে বা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কোনও গোষ্ঠী আবদ্ধ থাকিয়া থাকিলে তাহার কথা স্বতন্ত্র।

মূলতঃ ভাষার উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহা লইয়া বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। "ভেউ—ভেউ বাদ," "উহু—আঁহা বাদ," "হেঁইও—হাঁইও বাদ"—এখন প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বা অন্যবিধ মতবাদের উল্লেখ বা বিচার আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত।

মোট কথা, মানুষ ভাববিনিময় করিবার জন্য কতগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইঙ্গিত, চিহ্ন, সঙ্কেত ইত্যাদি কাজে লাগাইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ধ্বনিমূলক ভাববিনিময়ই অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইয়াছে। কেহ চক্ষুর অগোচরে, অন্ধকারে বা দূরে অবস্থিত থাকিলেও অপরের গলার আওয়াজে তাহার অনেকটা নাগাল পাওয়া যায়। এই জন্যই সকল উপায়ের মধ্যে মুখে ব্যক্ত শব্দ ব্যবহারেরই প্রচলন বেশী হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর মধ্যে উহার প্রচলন সর্ব্বত্র দেখা যায়; এমন কি, মনুষ্যেতর-প্রাণীজগতেও ধ্বনিমূলক ভাববিনিময় হইয়া থাকে।

টাইলরের মতে, ভাষা অর্থে আমরা বুঝি,—'the expression of ideas by means of articulate sound habitually allotted to those ideas'—অর্থাৎ **যে যে ভাব প্রকাশের জন্য যে যে উচ্চারিত শব্দ পূর্ব্বাপর প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই সেই শব্দের দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তিকে ভাষা বলা যায়।**

এইখানেই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কতগুলি শব্দের সহিত অভ্যস্ত প্রয়োগের দরুণ কতগুলি ভাব সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—অর্থাৎ কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে বক্তা ও শ্রোতা কতগুলি বিশেষ অর্থ বোঝে।

বক্তা ও শ্রোতার ভাবজগৎ যত অল্পপরিসর বা বিস্তৃত হইবে উহাদের ঐরূপ ভাববিনিময়ও ততই সংকীর্ণ বা সম্প্রসারিত হইবে। অন্য কথায়, শব্দ-সম্ভারের ঐশ্বর্য্যও অল্প বা অধিক হইবে।

বক্তা বা শ্রোতার ন্যায় গোষ্ঠী বা জাতির ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। আবার একই দল বা গোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের ধারা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অধুনা বহু জাতির সমন্বয়ে ও সভ্যতার বিস্তৃতিতে অনেকটা প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলাভাষাও এককালে যাহা ছিল তাহার চেয়ে এখন ঢের বেশী ভাবব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে উদ্ভূত হইয়া বাংলাদেশের প্রাকৃতজ শব্দ, বিকৃত ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, ফারসী, পোর্ত্তুগীজ, ইংরেজী শব্দ সম্ভারে পরিপুষ্ট হইয়া কতগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকের হাতে এক গৌরবময় অধ্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে। সুনীতি বাবুর কথায়, বাংলা সাহিত্যের এই যে গৌরব তাহা বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সংস্পর্শে ও সংঘাতের ফলে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে লইয়া।

বহির্জ্জগতের সংস্পর্শ ভাষার পক্ষে শ্রীবৃদ্ধিকর; উহার পরিপুষ্টিকারক।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে:

(ক) অভ্যস্ত প্রয়োগে শব্দবিশেষের সহিত অর্থ-বিশেষের সংযোগ প্রথমে হইয়া পড়ে। তার পর,—

(খ) ভাববিনিময়ের বিস্তৃতির দরুণ নূতন নূতন ভাবার্থক শব্দের প্রচলন হয়।

পুরাতন শব্দের **পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন** বা উহার **সমকক্ষ, বিপরীত** ইত্যাদি শব্দের আনুমানিক সংগঠন করিয়া বা প্রতিবেশী কোনও অপর দলের ব্যবহৃত শব্দ অবিকল বা বিকৃত ভাবে ধার

করিয়া লইয়া **কেহ** বা **কাহারা** জ্ঞাতসারে বা **অজ্ঞাতসারে** চালাইয়া দিলেই অপর লোক বা লোকেরা **অনুকরণবৃত্তিচালিত** হইয়া উহা **অবলম্বন করিয়া বসে** এবং **প্রয়োগ করিতে থাকে**। ইহার পর বহু লোকের অবিরত প্রয়োগেই ঐ **সকল শব্দ** ভাষায় স্থান পায়।

এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতেই হইবে যে, এই "কে" বা "কাহারা" যে কোনও অখ্যাত সামান্য ব্যক্তি হইতে পারে; পণ্ডিত, গণ্যমান্য বা দেশবরেণ্য না হইলে চলিবে না এমন কথা নাই। এই জন্যই শব্দের উৎপত্তির সঠিক কারণনির্দ্দেশ কষ্টকর; অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে অসম্ভব।

আবার এই জন্যই দেখা যায় যে, ভাষার জনক-জননী বলিয়া বিশিষ্ট কাহারও বা কাহাদেরও নাম লওয়া যায় না। কারণ, **ইহার** উৎপত্তি **দশজনের মুখে**; দশজনেই ইহাকে লালন-পালন করে। ইহার শ্রীবৃদ্ধির কৃতিত্বও দশজনের।

তবে কৃত্রিম ভাষা তৈয়ারীর চেষ্টাও যে হইয়াছে বা হইতেছে তাহা না বলিলেও চলে।

এখানে আমরা প্রচলিত স্বভাবজ ভাষার কথাই বলিতেছি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শব্দ বা **বাক্যই** ভাষার Unit বা **সূক্ষ্মতম অংশ**; **অক্ষর নহে**।

কোটী কোটী লোক ভাষার সাহায্যে আজীবন মনোভাব প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে অথচ ক, খ ইত্যাদি কতগুলি পৃথক অক্ষর যে আছে বা থাকিতে পারে বা থাকা উচিত, এ কথার খবরই রাখে না। রাখার দরকারও মনে করে না।

অক্ষর পরিচয়ের দরকার হয় 'লিখাপড়ার' দরকার হইলে। মানব সমাজে লক্ষ লক্ষ বৎসর 'লিখাপড়া'র কথাই উঠে নাই। মানুষের কাজ, কর্ম্ম, ভাববিনিময় অল্প পরিসরে সাময়িক কর্ত্তব্য-বোধেই চলিয়াছে।

তাই কোনও ভাষার ব্যাকরণে 'বর্ণমালা' লইয়া আলোচনা আরম্ভ করা **রীতিসিদ্ধ** হইলেও **অযৌক্তিক**।

শিশু 'মা,' 'বাবা,' 'দুধ,' 'ভাত' ইত্যাদি শব্দ শুনিতে শুনিতে শিখে—ম, ব, দ, ধ, ভ, ত শিখা, না শিখা অবসর ও সুযোগ সাপেক্ষ।

ভাষার শিক্ষা অনুকরণসাপেক্ষ। তাই মাতৃভাষা শিশু অতি সহজেই আয়ত্ত করে। বাঙ্গালী শিশুকে শৈশবে ইংলণ্ডে, চীনে বা জাপানে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিলে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সে অনায়াসে যথাক্রমে ইংরেজী, চৈনিক বা জাপানী ভাষা শিখিয়া বসিবে।

ভাষা আবার ভাবের বাহন বলিয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ ইহাতে প্রেম নিবেদন, সঙ্গীত-চর্চ্চা, শোকগীতি-রচনা করিয়া আসিয়াছে। ব্যাকরণ বলিতে কিছু ছিল না ; যাহার দ্বারা ভাষার ওজন করা হইত তাহা **'প্রয়োগ' – 'ইস্তিমাল'—'Usage'**।

বৈদিক শ্লোকসম্ভার, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন আরব্য কবিতা ও কাব্য, কোরান, পুরাণ ব্যাকরণের চোখ রাঙানির ধার ধারে নাই। অথচ উহার ভাষা ভাবের ঐশ্বর্য্যেরই পরিমাপক।

সকল ভাষায়ই 'ব্যাকরণের' উৎপত্তি হইয়াছে বহু পরে। 'ব্যাকরণ' ভাষাপ্রয়োগের 'বিশ্লেষণ' মাত্র—'নিয়ামক' নহে।

ভাষার সহিত ব্যাকরণের এই সম্বন্ধ ভাল মতে না বুঝিলে বিড়ম্বনার কারণ থাকিয়া যায়।

ব্যাকরণ যিনি বা যাঁহারা প্রণয়ন করেন তাঁহাদের সাহিত্যের উপর অন্যবিধ দখল নাও থাকিতে পারে। টমাস কার্লাইল বলেন, "In my opinion the best grammarians of the traditional type have been the worst writers and the best writers the worst grammarians."

এদিকে অনেকটা অযথা বাড়াবাড়ি যে করা হয় আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দরের মন্তব্য হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভাষাবিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "ইহা চণ্ডীদাসের পদেরও সমুদয় রস নিংড়াইয়া কেবল ছোবড়া ভক্ষণের জন্ম লালায়িত। চণ্ডীদাসের নিকট রামী রজকিনীর প্রেমনিকষিত হেমতুল্য ছিল কি না, ভাষাবিজ্ঞান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন; রামীর নাম চণ্ডীদাস দীর্ঘ ঈকারান্ত, না হ্রস্ব ইকারান্ত করিয়া লিখিতেন, তাহা স্থির না করিতে পারিলে এই বিজ্ঞানের সোয়াস্তি হয় না। রজকের স্ত্রী কতকাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন এড়াইয়া রজকী হইতে রজকিনীতে পরিণত হইয়াছে, তজ্জন্য এই বিজ্ঞান বিদ্যার শিরঃপীড়া ঘুচে না।"

অথচ অমর কবি সেক্সপিয়ার ব্যাকরণ জানিতেন না; ডঃ জনসন বিশ্বাসই করিতেন না যে ব্যাকরণ বলিয়া কোন জিনিস আছে।

বাস্তবিক পক্ষে:

(ক) **ব্যাকরণ ভাষার দাস; মনিব নহে।** ব্যাকরণ

বিশ্লেষণ করিয়া ভাষার মধ্যকার গঠনপ্রণালী বাহির করে; কোন বিষয়ে হুকুম দেয় না। যাহা চলিয়াছে তাহার ধারা আবিষ্কার করে: আইন প্রণয়ন করে না।

কথাটা আরও বুঝাইয়া বলা দরকার।

ভাষা স্রোতস্বতী নদীর মত নানা পাহাড়, পর্ব্বত, খাল, বিলের জলরাশি লইয়া ধাবমান। ব্যাকরণ উহার গতি কি ধারায় চলিয়াছে তাহার পরিচয় দেয়; উহার গতিধারা বাঁধিবার সাধ্য তাহার নাই।

ব্যাকরণ যদি বলে, কোনও প্রয়োগ অশুদ্ধ' তাহার অর্থ এই নহে যে, পণ্ডিত বিশেষের অমুক নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে অমন হইল; উহার অর্থ, ঐরূপ প্রয়োগ **পূর্ব্বকার ভাষার ধারার রীতিতে নহে**। কিন্তু দুই দিন পরে যদি কেহ বা কাহারা ঐরূপ প্রয়োগই প্রচলিত করিয়া বসে এবং তাহা যথেষ্ট লোকের দ্বারা গৃহীত হয় তাহা হইলে কিছু দিন পরে ব্যাকরণের অভিমতও বদলাইতে হইবে। কারণ, ব্যাকরণকার **'আইনপ্রণেতা'** নহে; **'গতিধারার পর্য্যবেক্ষক'**।

'আমি পড়ি,' 'সে পড়ে' ইত্যাদির 'পড়ি' এবং 'পড়ে'র রূপ কোনও ভগবান বা দেবতা চির দিনের জন্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, এমন নহে। এইরূপ 'বলিবার' বা 'লিখিবার' **'রীতি' চলিয়া আসিয়াছে** মাত্র। আজ যদি যথেষ্ট লোক 'আমি পড়ে,' 'সে পড়ি' বলিতে ও লিখিতে থাকে এবং এই রূপ সাধারণমতে প্রচলিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে এখনকার ব্যাকরণ যাহাই বলুক, কিছুকাল পরে উহাকেই শুদ্ধ মনে করিতে হইবে।

(খ) এই জন্যই, ব্যাকরণের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহাতে আমার ঢের আপত্তি আছে।

কেহ বলিয়াছেন, "যে শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিলে বাংলাভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম 'বাংলা ব্যাকরণ'।

কেহ লিখিয়াছেন, "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটী আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায় সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।"

মোটের উপর কাঁহারা এ কথা বলিয়াছেন সেটী প্রশ্ন নহে; সর্ব্বত্রই প্রায় ব্যাকরণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়।

অথচ যাহারা কথোপকথনে ভাষা ব্যবহার করে—তাহাদের বিপুল সংখ্যা ব্যাকরণের 'ব্যা'ও জানে না এবং যাঁহারা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্যাকরণ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যজগতে অমর দান করিয়া গিয়াছেন এবং পরেও অনেকেই ব্যাকরণের সূত্র যাচাই করিয়া লিখেন না। আমরা সেক্সপিয়ার, জনসন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যাকরণে কাঁচা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র কোনও ব্যাকরণপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না।

ভাষাকে কলার (Art) পর্য্যায়ে ফেলিলেই মনে হইবে যে, উহার ব্যবহার **ভাবের উপর নির্ভর করে,** ব্যাকরণের জ্ঞানের গভীরতার উপরে নহে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বাংলাভাষার ইতিহাস প্রায় ১০০০ বৎসর দীর্ঘ অথচ প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে। প্রত্যেক ভাষা সম্বন্ধেই এমন কথা খাটে।

(গ) ব্যাকরণের উদ্দেশ্যও সাধু এবং উহার জ্ঞান অর্জ্জনযোগ্য একথা স্বীকার করিয়াও আমরা বলিব, ব্যাকরণে **চুলচেরা বাদানুবাদ** এবং **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণবিভক্তি** পীড়াদায়ক। অর্থাৎ উহাতে অযথা বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে!

এ অভিযোগ সকল ভাষার ব্যাকরণের প্রতিই প্রযোজ্য। অনুসন্ধানবৃত্তি ভাল; কৌতূহলও জ্ঞানোদ্দীপক; কিন্তু অযথা বাড়াবাড়ি কোন ক্ষেত্রেই ভাল নয়। রামায়ণে কতগুলি 'র' বা কোরানে কতগুলি 'কাফ' আছে, এ যদি কেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন, তাহা হইলে বলিব, তাহার সময়ের অপব্যবহার করা হইল। এইরূপ অনুসন্ধানবিশারদকেও আমরা সহানুভূতির সহিত দেখিব, যদি তাহার শ্রম আবার অন্যকেও পীড়া না দেয়। অর্থাৎ যদি এই অনুসন্ধানের ফল মুখস্থ করিয়া ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় পাশ করিতে না হয়।

এতটা করা হয় না তাহাই স্বীকার্য্য। অথচ ব্যাকরণের অনাবশ্যক খুটিনাটিও এত বাড়ান হইয়াছে যে বড়দেরও মনে রাখিতে মাথা ঘোলাইয়া যায়।

অনাবশ্যক সূত্রযোজনা, বিকট নাম প্রদান, চুলচেরা ভাগাভাগি—সব যেন না হইলেই নয়।

'বর্ণমালা'— মুখে মুখে শিখিতে অল্পক্ষণ লাগে; ব্যবহার ত উহা শিখিবার পূর্ব্ব হইতেই করা হয়। অথচ এই সামান্য কটি

অক্ষরকে শ্রেণী, গোত্র, জাত, পাতে ভাগ করিবার কি ব্যর্থ প্রয়াস! 'স্বর' 'ব্যঞ্জন,' 'অল্পপ্রাণ' 'মহাপ্রাণ' 'দন্ত্য-তালব্য-মূর্দ্ধ'—'শ্বাস-নাদ-ঘোষ-উষ্ম স্পর্শ' ইত্যাদি ভাগাভাগি যেন না করিলেই নয়!

সমাস, সন্ধি, শব্দসাধন ইত্যাদিতেও হুড়োহুড়ি একই রকম!

যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া ঐরূপ তত্ত্ব আহরণ করিয়া ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আমরা বাধ্য।

কিন্তু তাঁহাদের রচিত ব্যাকরণকে **'ব্যাকরণের অভিধান'** হিসাবে ব্যবহার করিবার আমি পক্ষপাতী। 'শব্দের অভিধান' যেমন পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ান হয় না, উহা দরকার মত সাময়িকভাবে ব্যবহার্য্য; এইরূপ প্রচলিত ব্যাকরণও ঐরূপভাবে ব্যবহার করার যোগ্য।

ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক এই উৎকট ধারা, উপধারা বিশিষ্ট আইনকানুন দ্বারা পিষ্ট করা অনুচিত অর্থাৎ **পাঠ্য হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে** ঐ সকল **সূক্ষ্মতত্ত্ব** মুখস্থ করান বিশেষ আপত্তিকর। রোগের চেয়ে ঔষধই বেশী পীড়াদায়ক হইবে—এ কেমন চিকিৎসা!

আমার নিবেদন, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ এবং সমাজহিতৈষী শিক্ষানুরাগী সকলে আমার কথাগুলি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া মুখস্থ করাইবার অপরাধ হইতেও এই অপরাধ গুরুতর।

(ঘ) তবে কি ব্যাকরণ একেবারে বাদ দেওয়া যাইবে? আমি তাহা বলি না।

ব্যাকরণের মূল তত্ত্বকথাগুলি সকলকেই অল্প কথায়ই শিখাইয়া দেওয়া চলে। ইহার চেয়ে বেশী জানিতে হইলে বিরাট বিরাট 'ব্যাকরণ অভিধান' ত থাকিবেই। 'অভিধান' দেখিয়া যেমন শব্দের বানান, অর্থ ইত্যাদি বাহির করা যায়, 'বিশ্বকোষে' যেমন বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, 'ব্যাকরণকোষ' গুলিতেও তেমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকথাও গ্রথিত থাকিবেই। দেখিয়া লইলেই হইবে।

আমার মতে, ছেলেমেয়েদের তথা শিক্ষানবীশ সকলকেই ভাষার সুষ্ঠু লিখনকথনে উৎসাহ দিবার দরকার যদি থাকে তাহা হইলে ব্যাকরণের নিবিড় জঙ্গলের দিকে পথপ্রদর্শন করিয়া লাভ নাই; উৎসাহ দিতে হইবে উৎকৃষ্ট ভাষা বা সাহিত্য **শুনিতে** বা **পড়িতে**। যে যত বেশী **উৎকৃষ্ট ভাবধারার সুমার্জ্জিত প্রকাশ**—অর্থাৎ **উঁচুদরের সাহিত্য পাঠ ও মস্তিষ্কস্থ** করিবে তাহার ভাবধারা ও ভাষাও ততই উন্নত হইবে।

ব্যাকরণ ষ্টাইল বা রচনাভঙ্গি শিক্ষা দেয় না; ব্যাকরণ ভাষা ধারা উন্নত করে না—উহা করে উচ্চতর মনের ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সংস্পর্শ। যাহাদের পরীক্ষা দিবার দরকার নাই, অথচ লেখাপড়ার ঝোঁক আছে তাহাদেরও আমি এই পরামর্শই দিই।

বাংলাভাষার সংস্কার প্রয়াসে আমি শুধু সরল পথনির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র। আমার উদ্দেশ্য, ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ককে যতটা পারা যায় রেহাই দেওয়া; আমার উদ্দেশ্য শিক্ষানবীশ সকলকেই বাংলা অথবা যে কোনও ভাষা শিক্ষাপ্রণালীর গূঢ়তত্ত্বের বিষয়ে অবহিত করা; আমার উদ্দেশ্য বিদেশী এবং ভারতের অন্য ভাষাভাষী ভাইবোনদিগের বাংলা শিখিবার প্রধান বিভীষিকার লাঘব করা;

আমার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় তথা সর্ব্বজনীন ভাষায় উন্নীত করিবার প্রয়াস।

— ৩ —

কিংকর্ত্তব্যম্

আমি ব্যাকরণবিভীষিকা প্রসঙ্গের উল্লেখের প্রথমেই নিবেদন করিয়াছি, **ব্যাকরণবধকাব্য** রচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; উহাকে সরল সহজ ভাবে দাঁড় করাইয়া উহার সদ্ব্যবহার সকলকে অল্প কথায় শিক্ষা দেওয়া। এখন যে অবস্থা তাহাতে ব্যাকরণ জোর করিয়া মুখস্থ না করাইলে উপায় নাই। পরীক্ষার ভীতিই শুধু আমাদিগকে এইরূপ করিতে বাধ্য করে। অর্থাৎ আমাদের কোমল-মতি শিশুদেরই এই নীরস প্রাণহীন কাজে লাগিতে হয়।

অথচ ব্যাকরণ ব্যতিরেকেই যে কোটী কোটী জীব সারাজীবন মনোভাবের আদানপ্রদান করিতেছে এবং করিবে, তাহা আর না বলিলেও চলে।

আমাদের একটী চাকরাণী আছে। তাহার শব্দপুঞ্জী এত কম যে তাহাকে আমরা সভ্যতার নীচের স্তরের মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য করি। অথচ, অন্য কোন চাকর বা চাকরাণীর সঙ্গে যখন তুমুল ঝগড়া বাধে তখনই ইহার পূর্ণ বাকক্ষমতার পরিচয় পাই। তাহার বাক্যবাণ যে ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইতে থাকে, বাক্য সব ক্ষেত্রে

ব্যাকরণশুদ্ধ না হইলেও উহার 'অলঙ্কার,' 'শ্লেষ,' 'উপমা,' 'প্রতীপ,' 'রূপক,' 'দীপক,' 'বক্রোক্তি' যে অপ্রতিহতভাবে ছুটিতে থাকে তাহা দেখিয়া মনে হয়, ফনোগ্রাফে উঠাইয়া রাখিলে না জানি 'অলঙ্কার' অধ্যায়ে আমাদের ব্যাকরণে কতই কাজে লাগিত !

আমরা ব্যাকরণে বিশ্লেষিত কিম্ভূত-কিমাকার নামবিশিষ্ট ধাতু, সন্ধি, সমাস **শুনিয়া** বা **দেখিয়া** ব্যবহার করি **পূর্ব্বে**; ব্যাকরণে পড়ি **পরে**। অথচ অনায়াসে ব্যবহৃত সেই কথাগুলিকে কতই না উৎকট নাম দিয়া দুর্ব্বোধ্য করা হইয়াছে !

বর্ণমালাকে জাতপাতে ভাগ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এবার আর একটী উদাহরণ দেই।

"একাধিক শব্দ একত্র জুড়িয়া একটী বৃহৎ শব্দ সৃষ্টি করাকে **সমাস** বলে।"

এইরূপ সকল ভাষায়ই করা হয়। ইংরেজীতে অসংখ্য Compound-words আছে ; ফারসীতেও তাই ; আরবীতে কম। 'কিসে কি মিশিলে' কি নামকরণ করা যাইবে, ইহা লইয়া কোনও মাথাব্যথা নাই।

অথচ, আমাদের মাথাব্যথার অন্ত নাই। স্কুলের ত্রিসীমানাও যাহারা মাড়ায় নাই, আজীবন অক্ষরের সহিত যাহাদের পরিচয় হয় নাই, তাহারাও ঘোড়াগাড়ী, চাঁদমুখ, বাপমা, মশামাকড়, মামলা-মোকদ্দমা: বুকেপিঠে ইত্যাদি —যাবতীয় জোড়াশব্দ ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, অথচ আমাদের ছেলে মেয়েদের শিখিতে হইবে—যত সব নেহায়েৎ অপরিজ্ঞাত বিদ্ঘুটে নাম ও তাহার পরিচয়;

যথা: অলুক, দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি—ইত্যাদি। ইহাদের অনেকটার আভিধানিক কোনও অর্থই হয় না। আবার শুধু বহুব্রীহি শিখিলেই হইবে না। ব্যধিকরণ, সমানাধিকরণ, ব্যতিহার, মধ্যপদলোপীতে বিভক্ত বহুব্রীহি শিখিতে হইবে। হে দয়াময়! রক্ষা কর!—রক্ষা ত এক রকম করিয়াছেনই! না হইলে এই সকল সন্তানের হয় তো আবার নাতিপুতি জন্মিত।

আমার প্রচেষ্টা হইবে:

(ক) অনর্থক ভাগাভাগি পরিত্যাগ।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।

ভাগাভাগির যে বাড়াবাড়ি ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে তাহার অনেকটাই এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের **ব্যবহারিক জীবনে** যাহা অকেজো বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহা মুখস্থ বা মস্তিষ্কস্থ করিয়া লাভ নাই। যদি তর্ক বাধে বা কোনও কারণে উহার সূক্ষ্ম বিভাগ সম্বন্ধে জানিবার দরকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু বা অন্য কাহারও সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত ব্যাকরণের শরণাগত হইব।

প্রত্যহ যতগুলি লোকের সংস্পর্শে আমাদের আসিতে হয় তাহাদের প্রত্যেকের নাম, গোষ্ঠী, ধর্ম্ম, মতবাদ, ইত্যাদি জানিয়া লইবার দরকার নাই। যাহার সহিত যতটুকু কাজ তাহার সম্বন্ধে ততটুকুই জানা আমরা যথেষ্ট মনে করি। তাহা না হইলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনই বিড়ম্বিত হইবে।

ভাগাভাগির মস্ত বড় একটী দোষই এই যে, প্রত্যেক ভাগের

একটা নাম দেওয়ার দরকার হইয়া পড়ে। যেহেতু এই সমস্ত ভাগের ধার সর্ব্বসাধারণে মোটেই ধারে না, তাই উহাদের নামকরণ পণ্ডিতদের কষ্টকল্পনায় বিকট আকার ধারণ করে। 'অলুক' 'ধর্ম্মধারয়,' 'মধ্যপদলোপী,' 'বহুব্রীহি'—ইত্যাদির নামবৈচিত্র্য পণ্ডিতদের গৌরবের বিষয় হইলেও শিষ্যদের প্রাণান্তকর।

ভাগাভাগি করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বিবেচ্য হইবে, ইহা কি না হইলেই হয় না? যদি হয়, তাহা হইলে উহা হইতে আমরা বিরত হইব।

(খ) **অনর্থক সূত্রযোজনা করিব না।**

সূত্রের কাজই হইতেছে, **আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন** বহু কথার মধ্যস্থিত **সাধারণ** নিয়ম অথবা **বহু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধারার সন্নিবেশ** বাহির করা।

আমরা ১ হইতে ৯ এবং ০ শিখিয়া বা শিখাইয়া উহা দ্বারা ছোট বড় বিভিন্ন সংখ্যা অনায়াসে গঠন করিতে পারি; যোগ বিয়োগের সাধারণ নিয়ম একবার আয়ত্ত করা হইয়া গেলে প্রকাণ্ড বড় বড় অঙ্ক করিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হয় না। এই ক্ষেত্রে সূত্র শিখা বা শিখানো লাভজনক।

কিন্তু 'মূল' হইতে 'মৌলিক' শব্দ কি করিয়া হইল তাহা লইয়া সূত্রযোজনা নিরর্থক। কারণ, 'মূলের' সমকক্ষ শব্দগুলিকে ঐরূপ সাধারণ ভাবে গড়িয়া লইতে পারা যায় না। 'নীতি' হইতে 'নৈতিক' হয়; কিন্তু 'রীতি,' 'গীতি' হইতে 'রৈতিক,' 'গৈতিক' এর প্রচলন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ সূত্র আওড়াইয়া লাভ নাই। কি শিখিতে হইবে তাহা একটু পরেই নিবেদন করিতেছি।

আমার মতে, ব্যাকরণকে যদি কাজে খাটাইবার মত করিয় খাড়া করা হয় তাহা হইলে উহা হইতে এই সকল ভাগাভাগি, অদ্ভুত নামকরণ, অযথা সূত্রযোজনা উঠাইয়া দিতে হইবে। উহা ভাষার মূলতত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে এবং পরামর্শ দিবে,—সুসাহিত্য পড়িয়া বা শুনিয়া ভাষার লালিত্য ও সৌষ্ঠব অর্জ্জন করিতে।

— ৪ —

ব্যাকরণের মূল তত্ত্বকথা

শব্দতত্ত্ব

আমাদের মনে রাখিতে হইবে :

(১) **শব্দ বা বাক্যাংশই ভাষার unit বা সূক্ষ্মতম অংশ; অক্ষর নহে।**

তাই চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা **'শব্দের'** আলোচনাই 'বর্ণমালার' আলোচনার পূর্ব্বে করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে জগতের একটী বিরাট ভাষার উল্লেখ করা যায়। উহা কোটী কোটী চীনাদের ভাষা

উহাতে আমাদের মতন কোনও অক্ষর বা বর্ণমালা নাই; আছে শুধু 'শব্দ'—ছোট ছোট শব্দ। এক একটী ক্ষুদ্র চিত্র দিয়া একটী শব্দ লিখা হয়। 'সূর্য্য' শব্দটী বুঝাইবার জন্য চীনারা উহার আকৃতির ন্যায় একটী চিত্র অঙ্কন করেন। 'নারী,' 'শিশু,' 'নদী,' 'পাহাড়' ইত্যাদির জন্য অনুরূপ 'চিত্রশব্দ' লিখিবার প্রথা আছে।

একটী অর্থ বুঝাইবার জন্য আবার অনেক সময়ে তিন চারিটী শব্দচিত্র লাগে। 'লুট' কথাটা 'একটী মানুষের পিছনে মানুষ ধাওয়া

করিতেছে'—'গল্পগুজব' 'তিনটী মেয়েমানুষ একত্র'—'স্ত্রী' 'একটী নারী ঝাঁটা লইয়া'—'সন্ন্যাসী' 'একটী মানুষ ও পাহাড়,' অঙ্কিত করিয়া বুঝান হয়। আবার 'সিগারেট' 'ধূঁয়ার চক্র,' 'ক্যামেরা' 'ছবিতুলা যন্ত্র' ইত্যাদি ভাবে ভাঙ্গাইয়া লিখা হয়।

বলাবাহুল্য এই জন্য চীনাদের ভাষা অন্যের পক্ষে আয়ত্ত করা সুকঠিন, চীনাদের ছেলেমেয়েদেরও খুব আয়াসসাধ্য।

চীন জাপানের ছেলেমেয়েদের প্রায় ২০০০।৩০০০ শব্দচত্র শিখিতে দশ বার বৎসর বয়স হইয়া পড়ে। ৪০০০।৫০০০ না শিখিলে তাহারা খবরের কাগজ পড়িতে পারে না।

আমাদের এখানে বক্তব্য এই যে, ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ শব্দ, অক্ষর নহে। অক্ষরের সাহায্যে লিখন পঠন যে সহজসাধ্য হয়—সে কথা সত্য ও স্বতন্ত্র।

আমি যদি ধ্বনি করি হ-য-ব-র-ল-ত-র-ণ-র, তাহা হইলে শ্রোতা কেহ থাকিলে একটা আওয়াজ অবশ্য শুনিবে; কিন্তু আমি কি বলিতেছি তাহা বুঝিতে পারিবে না। ইহার পরিবর্ত্তে যদি বলি 'আমার হাত ধর' তাহা হইলে শ্রোতা বুঝিবে তাহাকে কি করিতে বলা হইতেছে। আমার কথার প্রত্যেক অংশ (আমার; হাত; ধর) এক একটী শব্দ। এইরূপ শব্দ লইয়াই ভাষা।

এই শব্দগুলি আমরা ছোটবেলা হইতে শুনিয়া শুনিয়া এবং লেখাপড়া আরম্ভ করার পর হইতে চোখ দিয়া দেখিয়া দেখিয়া শিখি। অর্থাৎ আমার পূর্ব্বেই যে সকল শব্দ লোকের **অভ্যস্ত প্রয়োগে** প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাই আমি ব্যক্তিগত জীবনে শিখি এবং ব্যবহার করি। আমি বা আমরা যে নূতন শব্দ একেবারে

বানাইয়া লই না তাহা নহে ; তবে শুধু বানাইলেই হইবে না—ঐরূপ শব্দ যথেষ্ট লোকে ব্যবহার না করিলে সাধারণতঃ উহা ভাষায় স্থায়ী স্থান পায় না।

আমরা **অনুকরণপ্রিয়** ; তাই কাহাকেও বা কাহাদেরও ব্যবহার করিতে না শুনিলে বা কাহারও বা কাহাদেরও লেখায় ব্যবহার হইয়াছে না দেখিলে, অভিধান হইতে অসাধারণ একটা শব্দ ধরিয়া আনিয়া প্রথম ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করি—কেমন কেমন লাগে।

ইহার কারণই এই যে, শুধু শব্দের একটা অর্থ থাকিলেই চলিবে না, উহা আমাদের **কানে ভাল শোনা** বা **মনে ভাল লাগা** চাই। এবং এই ভাল শোনা বা লাগা অনেকটা নির্ভর করে অন্যের ভাল শোনা বা লাগা—অর্থাৎ **প্রচলিত প্রয়োগের** উপর।

'আমার মেয়েমানুষ' অভিধান বা ব্যাকরণ মতে আমার 'স্ত্রীকে' বুঝাইতে পারে এবং এই হেতু আমি ঐরূপ বলিতেও পারি। কিন্তু আমার কান এবং মন কেন যেন উভয়ই বিদ্রোহ করিবে!

আমি 'ফল গিলিতেছি' বা 'ভাত পান করিতেছি' ব্যাকরণগত শুদ্ধ হইলেও আমরা পছন্দ করি না।

'কলা' 'কথা' 'করা' ইত্যাদি শব্দ ভাষায় স্থান পাইয়াছে ; অথচ 'কখা' 'কগা' বলিয়া কোন শব্দ নাই কেন ?

তাহার উত্তর– কেহ এইরূপ শব্দ চালাইয়া দেয় নাই বলিয়া। আজ যদি কেহ 'চখা' জাতীয় কোন পাখীর নাম 'কখা' বলিয়া রাখে এবং দশজনে উহা বলিতে ও বুঝিতে থাকে, তবে উহাও অনতি-বিলম্বে অভিধানে জায়গা পাইবে।

অভিধানকার এ কথা বলিতে পারেন না যে, তিনি যাহা রেকর্ড করিয়াছেন ভাষার শব্দমালা উহাতেই সীমাবদ্ধ।

এই হেতু দশজনের মুখে নূতন শব্দের প্রচলন হইয়া পড়িতেছেই।

(২) পুরাতন শব্দের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন—উহার সমকক্ষ বা বিপরীত শব্দের ইচ্ছাকৃত বা আকস্মিক সংগঠন—ভিন্ন ভাষা হইতে অবিকল বা বিকৃত ভাবে ধার গ্রহণ—ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়ই ভাষার শব্দপুঁজি আহরিত হইয়াছে এবং হইতে থাকিবে।

বাংলা ভাষার শব্দমালা কোথা হইতে আহরিত হইয়াছে তাহা বলিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন :

"বাংলা ভাষা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল হইল উদ্ভূত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে প্রাকৃতের পরিবর্ত্তনে ; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রাকৃতজ শব্দ আছে ; বিশুদ্ধ ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে ; ইহার প্রাচীন যুগ হইতেই আগত দেশী বা অনার্য্য শব্দও কিছু কিছু আছে ; এবং ইহাতে আগত বিদেশী ভাষা ফারসী, পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজী হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে।" বলা বাহুল্য, আরবী এবং ইদানীং উর্দ্দু, হিন্দী হইতেও কিছু কিছু শব্দ আসিতেছে।

মোট কথা, কোথা হইতে আসিয়াছে বা আসিতেছে ইহা লইয়া ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। বহির্জ্জগতের সংস্পর্শই ভাষার সমৃদ্ধির প্রধান কারণ।

ইংরেজী বা অন্য কোনও ভাষার কাছে ঋণ স্বীকার করাটা খুব

অপরাধের কারণ নহে। কারণ, ইংরেজীতেও নিজস্ব পুঁজি হইতে ধার করা পুঁজি বেশী।

মোট কথা, আমাদের মাতৃভাষার শব্দমালা নানা উৎস হইতে গৃহীত। ইহার মধ্যে :

(ক) সংস্কৃত হইতে অবিকৃত বানানে চলিয়া আসা অর্থাৎ 'তৎসম';

(খ) উহা হইতে বিকৃতভাবে চলিয়া আসা অর্থাৎ 'ভগ্ন-তৎসম' বা 'অৰ্দ্ধ-তৎসম';

(গ) বাংলার প্রাকৃতজ অর্থাৎ নিজস্ব বা 'তদ্ভব';

(ঘ) ভারতীয় অন্যান্য ভাষা, যথা : হিন্দী, মারহাট্টি বা বিদেশী, যথা : আরবী, ফারসী, ইংরেজী ভাষা হইতে গৃহীত—শব্দ শ্রেণীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, ইংরেজী, আরবী, ফারসীরও শব্দমালা অবিকৃত বা বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ উহারও 'তৎসম' ও 'ভগ্নতৎসম' আকার বিদ্যমান।

শব্দের উৎপত্তির ধারা সম্বন্ধে প্রাথমিক এতটুকু জ্ঞান থাকিলেই চলিবে। শব্দের অনর্থক জাতপাত ভাগাভাগি—অর্থাৎ কোনটা স্বজাতীয়, কোনটা বিজাতীয় এবং উহার জনক, জননী, পিতামহ, প্রপিতামহ, কে বা কি বা কাহারা ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

আমি যে স্তূপের মধ্যে এখন লিখিতেছি তাহার মধ্যে চেয়ার, টেবিল, ফরাস, বহি, পুস্তক, দোয়াত, কালি, দেরাজ, কলম, কাগজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ; অথচ ইহারই মধ্যে ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী,

ফারসী শব্দ আসিয়া পড়িল। এই বিজাতীয় আগন্তুকদের বর্জ্জন করিবার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

আবার ইংরেজীতেই 'চেয়ার,' 'টেবল,' অথবা আরবীতেই 'কলম,' 'কাগজ' কি ভাবে আসিল তাহার পশ্চাতে বিরাট ইতিহাস আছে।

আমরা নিজেদের বাবার বাবা বা তাঁর বাবা পর্য্যন্তই খবর রাখি। ইহার বেশী অনেকেরই জানা থাকে না। জানিবার বিশেষ দরকার আছে বলিয়াও অনেকেই মনে করে না। 'আজ' শব্দটী 'অদ্য' হইতে 'অজ্জ'—'অজ্জিং'—'অজ্জি'—'আজি' রূপ পাইতে পাইতে আসিয়াছে ইহা জানা তথ্যবিশারদের কাজ। 'অদ্য' শব্দটী অবিকৃত অবস্থায়ও প্রচলিত আছে বলিয়া উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা আমরা জানি।

যাহাদের এই প্রকার ইতিহাস জানিবার ঔৎসুক্য রহিয়াছে তাহাদের সম্মুখে **ভাষাতত্ত্বের** বিরাট প্রান্তর উন্মুক্ত। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে আমি যতটুকু বলিলাম ততটুকু জানাই যথেষ্ট।

(৩) **সহজতম প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়া ভিন্ন শব্দরূপ গঠিত হয়। এই সকল ভিন্নরূপ একই বা বিভিন্ন ভাবার্থক হইয়া থাকে।**

যথা : মা, মাতা, মায়ের, মাতৃ ; বোধ, বোধক, বুদ্ধ, প্রবোধ, বুদ্ধি, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী ইত্যাদি।

কি ভাবে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে তাহার উত্তর দিতে হইলে আমাদের বলিতে হইবে,—**ঐরূপ প্রচলনে।** ঐরূপ ভাবে অন্য শব্দকেও রূপান্তরিত করা হইতেছে এবং হইতে থাকিবে; তবে উহার মধ্যে **প্রচলিত রূপই** ভাষায় স্থান পাইবে। 'শব্দে'র উৎপত্তির ধারার যে ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি এখানেও তাহাই খাটিবে।*

(৪) শব্দ কোনও ভাবকে প্রকাশ করে; তাই শব্দ নামবাচক, ক্রিয়াবাচক, গুণবাচক বা বিবিধ ভাববাচক হইতে পারে।

চিরাচরিত রীতিতে শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগের বাহুল্য দেখা যায়। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ইত্যাদি ভাগাভাগি

---

* এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্যাকরণের বিরাট ও উৎকট এক অধ্যায়ের সারমর্ম্ম আমি সহজ একটী সূত্রে গ্রথিত করিতেছি।

'ধাতু'—'প্রকৃতি'—ইত্যাদির সহিত ব্যাকরণের বাহিরে কাহারও পরিচয় ঘটে না। 'খিচ্' 'উড়' 'আওড়' 'ধাতু' এবং উহার সহিত অ, আ, অন্, ণক, অত, ইত, ইত্যাদি 'প্রত্যয়' যোগ করিতে হয় একথা বহু লোকেরই সারা জীবন জানিবার সুযোগ বা ঔৎসুক্য ঘটে না। আমি 'মৌলিক,' 'সাধিত,' 'প্রত্যয়-নিষ্পন্ন,' 'সমস্ত,' 'কৃৎ,' 'তদ্ধিত, ''যৌগিক,' 'রূঢ়'—ইত্যাদি উৎকট শ্রেণীবিভাগ একেবারে বাদ দিলাম। ইহার অর্থ এই নহে যে, উহা শিক্ষা করা পাপ,—আমার মতে সাধারণের পক্ষে উহা খুব পুণ্যের কাজও নহে। ছেলেমেয়েদের পক্ষে উহা আয়ত্ত করা প্রায় সাধ্যাতীত।

করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না। উহার প্রত্যেকটির আবার উপবিভাগের ছড়াছড়ি দেখিলে তাক লাগিয়া যায়! বিশেষ্যকে আবার বস্তুবাচক, গুণ, ধর্ম্ম ও কার্য্য-বাচক ইত্যাদিতে, আবার বস্তুকে ব্যক্তি, স্থান, সমষ্টি, ভৌতিক, ইত্যাদিতে ভাগ করিবার প্রবৃত্তি দেখিলে চক্ষুস্থির হইতে চাহিলেও মস্তিষ্ক গরম হইবার উপক্রম হয়। সাদা বস্তু, কাল বস্তু, নরম বস্তু, শক্ত বস্তু, তরল বস্তু কঠিন বস্তু, কেন ফিরিস্তিভুক্ত করা হইল না তাহা বুঝিয়া উঠা মুশকিল! সাধারণতঃ **নামবাচক** শব্দ, **গুণবাচক** শব্দ, **ক্রিয়াবাচক** শব্দ, এতদ্ভিন্ন **বিবিধ ভাববাচক** শব্দ আছে জানিতে পারিলেই ভাল হয় মনে করি।

শব্দের অর্থের শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে শেষ করিয়া উঠা কঠিন। এইরূপ বিভাগের ধারার ধার না ধারিয়াই সাধারণ লোকের শব্দযোজনা ঠেকিয়া থাকে না, পাঠক বা লেখকদেরও কোনও কষ্ট হইবে না।

লিঙ্গ

(৫) (ক) লিঙ্গভেদে পুরুষ বা স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর জন্য বিভিন্ন শব্দ বা একই শব্দের সামান্য পরিবর্তিত রূপ ব্যবহৃত হয়।

যথা: পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভ্রাতা-ভগ্নী, নর-নারী।

নরহাতী-মাদীহাতী, মহিলা প্রতিনিধি ইত্যাদিকে যুক্ত শব্দের পর্য্যায়ে ফেলা যায়।

(খ) ভাষা হইতে লিঙ্গভেদ যথাসম্ভব উঠাইয়া দিতে হইবে।

যথা: পাঠক, শিক্ষক, শ্রোতা, সভা, সুন্দর বালিকা, মহা জনসমাগম, মহান সভা, সুশীল কন্যা, স্নেহময় মাতা, অভাগা ছেলে, বৃদ্ধ নারী।

প্রাণহীন বস্তুতেও লিঙ্গ আরোপ করা সকল ভাষায়ই একটা প্রথা দেখা যায়। এই অনাবশ্যক প্রথা প্রাচীন কুসংস্কারমূলক ধারণা হইতে অনেকটা উদ্ভূত। প্রকৃতির নানা উপাদান বা বস্তুকে তখন বাস্তবিকই প্রাণবান মনে করা হইত।

অধুনা ইহার দরুণ উপস্থিত হইয়াছে এক দারুণ সমস্যা!

যেখানে একই অর্থে উভয় লিঙ্গ বুঝা যায়, সেখানে কোন অসুবিধা হয় না, যথা: সে, আমি, তাহারা, তুমি। অথচ ইংরেজীতে I, You, Theyতে যাহা অনাবশ্যক তাহা He এবং Sheর মধ্যে করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় **লিঙ্গবিভ্রাট** আরও প্রকট। ফারসী ভাষায় খুব কম, নাই বলিলেই চলে। উর্দ্দু ভাষা অতি আধুনিক ভাষা হইয়াও কি করিয়া জগতের প্রায় সকল কথাকেই এক বা অপর লিঙ্গ আরোপ করিল তাহা বুঝা দুষ্কর। উর্দ্দু ভাষা যাঁহারা জানেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, **কত বড়** এক বিড়ম্বনা এই **লিঙ্গবিভ্রাট**।

বাংলা ভাষায় যাহা আছে তাহাও অরক্ষণীয়: 'পাঠ করে যে' এই অর্থে 'পাঠক' হইলে আবার 'পাঠিকা'র দরকার কি?

কথা হইবে, 'পাঠিকা'ই বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইলে কি করা হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে, এ সব ক্ষেত্রে 'মেয়ে পাঠক,'

'নারী-শিল্পী,' 'মহিলা-কবি' ইত্যাদি চলিবে। এইরূপ লিঙ্গভেদ করিবার প্রয়োজনও হয় খুব কম।

কতকটা স্ত্রীলিঙ্গার্থক শব্দ রাখিতেই হইবে। এ জন্যই আমি 'যথাসম্ভব' কথাটা সূত্রে প্রয়োগ করিয়াছি। যথা : নারী, বালিকা, মাতা।

'পরিষ্কার লিঙ্গার্থক' শব্দ ছাড়া প্রাণহীন বস্তুর কোনও লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবে না। লিঙ্গের কথা যেখানে উঠেই না বা যাহারা লিঙ্গ হইতে বঞ্চিত তাহাদের লিঙ্গ লইয়া মাথা ব্যথার প্রয়োজন কি? উহাদের গুণাত্মক বা ক্রিয়াবাচক ইত্যাদি শব্দ পুংলিঙ্গের মতই রূপ ধারণ করিবে।

প্রথম প্রথম শ্রুতিকটু লাগিলেও আমাদের কান ও রুচি অতি অল্প কালের মধ্যেই ঐরূপ প্রয়োগ মানিয়া লইবে।

বচন

(৬) শব্দের দ্বারা একাধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে সাধারণতঃ রা, গুলি, সব, সমূহ, গণ ইত্যাদি যোগ করা হয়।

যথা : মানুষেরা, পাখীসব, জলরাশি।

দ্বিবচনের বিশেষ বালাই না থাকা বাংলা ভাষার একটা সৌভাগ্য

বহুত্ববোধক বিশেষণ যোগ করিয়া বহুবচন প্রকাশ করা যায়। তাহার জন্য কোনও বিভক্তির প্রয়োজন নাই। যথা : অনেক লোক, বহু ঘোড়া।

সন্ধি

(৭) একাধিক শব্দ মিলিত হইলে অনেকক্ষেত্রে একটীর বা অন্যটীর বা উভয়ের অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ইহাকে **সন্ধি** বলে।

সন্ধির ধারা, উপধারা এত গোলমেলে যে তাহা লইয়া মাথা ব্যথা করাই উচিত নহে। 'ইহার' পরে 'উহা' আসিলে 'এটা' হয় বকিয়া বকিয়া ছেলেমেয়েরা মস্তিষ্ক গরম করিয়া ফেলে। অথচ শুধু বলিয়া দিলেই হয় যে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ধারা বহু। **প্রয়োগ দেখিয়া শিখিতে হয়।**

অতি + আচার = অত্যাচার ;

নব + অন্ন = নবান্ন ;

বিদ্যা + অলঙ্কার = বিদ্যালঙ্কার।

ঈ, ঊ, ঐ, ঔ-কারে পর্য্যবসিত হয় এমন শব্দ এখন পরবর্ত্তী বানানসংস্কার প্রস্তাবে সোজা হইয়া যাইবে।

সন্ধিসাধিত শব্দগুলিকে আমরা এখন যেমন আছে তেমনই উচ্চারণ করিব কিন্তু বানান একেবারে সরলীকৃত হইবে।

সন্ধি শিখাইতে গিয়া সামান্যব্যবহৃত যুক্তশব্দের বহুবিধ ধারা, উপধারা চালাইবার অনর্থক চেষ্টা করা হয়।

জোড়াশব্দ

(৮) একাধিক শব্দ একত্র জুড়িয়া জোড়া শব্দ গঠিত হয়।

এইরূপক্ষেত্রে **শব্দক'টী 'সমাস'**বদ্ধ এ কথা বলা হয়।

ঘোড়াগাড়ী = ঘোড়ার গাড়ী ;

ঢেঁকিছাঁটা = ঢেঁকি দিয়া ছাঁটা হইয়াছে এমন ;

পিতামাতা = পিতা ও মাতা ;

চাঁদমুখ = চাঁদের মত মুখ যাহার ;

মনোবিজ্ঞান = মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

গায়েহলুদ = গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে ;

চিকনপেড়ে—যে কাপড়ের পাড় চিকন ;

কালসাপ = কাল হইয়াছে যে সর্প ; ইত্যাদি।

এই প্রক্রিয়ায় কথার ব্যয়সঙ্কোচ সাধিত হয়। সকল ভাষায়ই এইরূপ সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার আছে ; ইংরেজী, ফারসীতে অসংখ্য।

জোড়াশব্দ যে শুধু সংস্কৃতে সংস্কৃতে বা সংস্কৃতে বাংলায়ই হয় তাহা নহে। দেশী-বিদেশী, বিদেশী-বিদেশীতেও হয়।

যথা : ধনদৌলৎ, লজ্জাসরম, কাণ্ডকারখানা, লোকলস্কর ; চেয়ারটেবিল, স্কুলকলেজ, খোশতবিয়ত, রদবদল, কাগজকলম, ইত্যাদি।

অন্যান্য ভাষায় এইরূপ শব্দকে **জোড়াশব্দ** (Compound Words) বলিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহার সূক্ষ্ম ভাগাভাগি লইয়া মাথা ঘামানো হয় না।

অথচ সংস্কৃত হইতে শ্রেণীবিভাগ টানিয়া আনিয়া বাংলায়ও মহা বিভ্রাট ঘটানো হইয়াছে। পরবর্ত্তী তালিকার বহর দেখিয়াই অনুমিত হইবে, কী খিচুড়ি পাকানো হইয়াছে।

'দ্বন্দ্ব,' 'তৎপুরুষ,' 'কর্ম্মধারয়,' 'দ্বিগু,' 'বহুব্রীহি'—ইত্যাদির আবার উপভাগের অন্ত নাই :

'অলুক-দ্বন্দ্ব,' 'ইত্যাদি-অর্থে-দ্বন্দ্ব,' 'সমার্থক-দ্বন্দ্ব' ; 'কর্ত্তৃবাচক প্রথমা-তৎপুরুষ,' 'কর্ম্মবাচক দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ,' 'করণবাচক তৃতীয়া-তৎপুরুষ,' 'উদ্দেশ্যবাচক চতুর্থী-তৎপুরুষ,' 'উপপদ-তৎপুরুষ'; 'নঞ্-তৎপুরুষ,' 'অলুক তৎপুরুষ,' ইত্যাদি ; 'সাধারণ-কর্ম্মধারয়,' 'বিশেষণ পূর্ব্বপদ,' 'বিশেষণোত্তর পদ,' ইত্যাদি লইয়া 'মধ্যপদলোপী,' 'উপমান,' রূপক' ইত্যাদি কর্ম্মধারয় ; 'ব্যধিকরণ,' 'সমানাধিকরণ,' 'ব্যতিহার,' 'মধ্যপদলোপী' বহুব্রীহি ইত্যাদিতে নামকরণের বাহাদুরী থাকিলেও শিক্ষার্থিদের মরণ আর কি !

সামান্য ব্যাপারকে ঘোলাইয়া তুলিবার অপচেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে মাত্র !

বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োগসিদ্ধ বা প্রচলিত জোড়া শব্দ ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না ; মূর্খ, নিরক্ষর লোকেরাও অহরহ 'কোলেপিঠে' করিয়া 'ছেলেমেয়েকে' 'লালনপালন' করে ; 'দরকারমত' 'মাছমাংস' খাইতে দেয় ; 'বকাঝকা' করে ; 'খেলাধূলা' শিক্ষা দেয় ; 'বিয়েসাদী' দিয়ে 'ঘরমুখো' করে।

'সমাস' কি ? বিক্ষিপ্ত শব্দগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়া। ছেলেমেয়েরা জোড়া শব্দ ব্যবহার করিবে ; সংযুক্ত যে হইয়াছে ইহাই জানিবে ; ঐ সংযোগের উদ্ভট নাম কি তাহা জানিবার বা বলিবার ধার ধারিবে না ইহাই আমার প্রস্তাব।

——

— ৫ —

একাধিক শব্দ যোজনা

বা

বাক্যরীতির মূলতত্ত্ব

আমি 'শব্দ' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা প্রচলিত ব্যাকরণের শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী অযথাবর্দ্ধিত আলোচনার সারমর্ম্ম। আমি শিক্ষানবীশদের রেহাই দিবার পক্ষপাতী। মূলতত্ত্বকথাগুলি মুখস্থ করা লাগিবে না; মস্তিষ্কস্থ করিতে হইবে। কূটতাত্ত্বিকের প্রশ্নের উত্তর বড় বড় ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে; অভিধানের মত দরকার মত দেখিয়া লইলেই চলিবে।

(১) 'শব্দ' অর্থমূলক ধ্বনির অংশবিশেষ হইলেও বক্তার মনোভাব পূর্ণতরভাবে প্রকাশ পায় একাধিক শব্দের সংযত সমাবেশে (বাক্যে)।

শুধু 'ভাত' দিয়া আমরা বস্তুবিশেষ বুঝি। ছেলে উহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে আমরা বুঝি সে 'ভাত দাও' বলিতেছে। এ ক্ষেত্রে 'দাও' কথাটা উহ্য থাকে। ছেলের ভাবগতিক দেখিয়া আমরা বুঝিয়া লই। কিন্তু কেহ নিরুদ্বেগে শুধু 'ভাত' বলিলে বা

কোথায়ও শুধু 'ভাত' কথাটা লেখা থাকিলে কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

এখানে 'চল' 'এস' ইত্যাদি একটী মাত্র শব্দে যে বাক্য প্রকাশিত হয় তাহা আলোচ্য নহে। ঐ সব ক্ষেত্রে আগে পাছে অন্য শব্দ উহ্য থাকে।

পক্ষান্তরে আবার শুধু একাধিক শব্দ অসংলগ্নভাবে বলিলে বা থাকিলেই হইবে না।

'রাম শ্যাম ধায় চোর বাড়ী ঘর' এখানে কতগুলি শব্দের সমাবেশ আছে কিন্তু অর্থপূর্ণ সুবিন্যাস নাই : তাই বিশেষ কোন মনোভাব প্রকাশিত হয় নাই।

এই মূল কথাটি না বুঝিলে আর সব ঘোলাইয়া যাইবে। বাস্তবিক পক্ষে, এ ক্ষেত্রেও 'কর্ত্তৃ' 'ক্রিয়া' 'উদ্দেশ্য' 'বিধেয়' ইত্যাদির বর্ণনাবাহুল্য দেখা যায়।

আমার মতে, 'কর্ত্তা,' 'কর্ম্ম,' 'ক্রিয়া' ইত্যাদির ব্যাখ্যা এবং কোন্ কোন্‌টা না হইলেই চলিবে না—এরূপ নির্দ্দেশ করা অনর্থক।

বাক্য যোজনার সফলতা, বিফলতা নির্ভর করিবে উহা বক্তা ও শ্রোতার বোধগম্য হওয়া-না-হওয়ার উপর। কয়টী শব্দ কিভাবে সাজাইতে হইবে তাহার উপরে নহে।

শব্দের অর্থ যেমন 'প্রচলিত প্রয়োগের' উপর নির্ভর করে একাধিক শব্দযোজনার রীতিও তেমনই প্রয়োগসম্ভূত।

এ সম্বন্ধে 'হইতেই হইবে' বা 'না হইলেই চলিবে না'—এমন কথা খাটিবে না। মানব সমাজের নানা গোষ্ঠীর এ বিষয়ে নানা রুচি।

তাই নানা ভাষায় **বাক্যে প্রযুক্ত পদের ক্রম** (sequence or order of words) নানা রকম।

অভ্যস্ত প্রয়োগই কানে ভাল শোনায় এবং বুঝিতে সহজ হয় এই জন্য সাধারণতঃ নিজেদের রীতিকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বা অপরদের চেয়ে বেশী ভাল মনে করার দৌর্ব্বল্য প্রায় সার্ব্বজনীন। অথচ 'যার যার ভাল তার তার কাছে'।

আমি পুস্তকটী পড়িয়াছি—বাংলা। পুস্তকম্ অধীতবানহম্—সংস্কৃত (পুস্তকটী পড়িয়াছি আমি)। কাদ্ কারা' তোল কিতাবা—আরবী (ছি পড়ে টী পুস্তক)। মান্ আঁ কিতাব রা খান্দা'য়াম—ফারসী (আমি ঐ পুস্তককে পড়িয়াছি)। ম্যয় উস্ কিতাব পড়্ হ্ চুকা—উর্দ্দু (আমি ঐ পুস্তক পড়িয়া ছি)। আই হ্যাভ রেড্ দি বুক—ইংরাজি (আমি ছি পড়িয়া টী পুস্তক)।

এই যে বিভিন্ন সাজাইবার প্রথা এর কোন্‌টাকে ভাল বলিব? আবার বলিতে হইবে,—'যার যার ভাল তার তার কাছে'!

ইহার উপরে আবার একই ভাষায় নানাদিকে জোর (Emphasis) দিতে গিয়া নানাভাবে সাজাইবার দরকার হয়।

আমি পুস্তকটী পড়িয়াছি।
পুস্তকটী **আমি** পড়িয়াছি।
পড়িয়াছি আমি পুস্তকটী।
পুস্তকটী পড়িয়াছি **আমি**।
আমি **পড়িয়াছি** পুস্তকটী।

ইহার প্রত্যেকটীরই একটী বিশেষ ভাবের অর্থ আছে।

আবার— আমি পুস্তকটী পড়িয়াছি।

আমি পুস্তকটী পড়িয়াছি?

আমি পুস্তকটী পড়িয়াছি!

একই ভাবে সাজানো এই তিনটী বাক্যের আবার তিন রকম অর্থ!

এত যার লীলাবৈচিত্র্য তার গতিপথ বাঁধিবে কে? বাঁধিবই বা কেন? ভাষার যদি সম্পদ কিছু থাকে তাহা ত এই!

বাক্যের 'সরলতা,' 'জটিলতা,' 'যৌগিকতা'—নির্ভর করে শব্দবিন্যাস ও ভাবপ্রকাশের উপরে।

অথচ, হে দয়াময়! অকারণ শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা এখানেও কি কম করা হইয়াছে!

'বিশেষ্যধর্ম্মী আশ্রিত বাক্যাংশ'—'বিশেষণধর্ম্মী বাক্যাংশ'—'ক্রিয়া-বিশেষণধর্ম্মী বাক্যাংশ'—আরও কত কি! 'লঘু,' 'গুরু,' 'হালকা,' 'গম্ভীর,' 'নরম,' 'গরম,' 'শুষ্ক,' 'তরল,' 'সহজ,' 'কঠিন,' 'ছোট,' 'বড়,' 'মাঝারী,'তে কেন শ্রেণীবিভাগ হইল না কে বলিবে?

'ধারা,' 'উপধারা' বাঁধিয়া কে কোথায়, কোন্‌টী কাহার পূর্ব্বে বসিবে ইহা লইয়া মহাভারত রচনা করা হইয়াছে!

(২) **বাক্যের বিভিন্ন শব্দ (পদ) পারস্পরিক সঙ্গতি বা মিল রক্ষা করে।**

বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন ফুল সাজাইয়া যেমন ছোট বড় মালা গাঁথা যায় তেমনই বিভিন্ন শব্দ সাজাইয়া ছোট বড় বাক্য বানানো হয়। **সূতা** যেমন ফুলে ফুলে **যোগ করিয়া** গাঁথে, **অর্থও** তেমনই শব্দে শব্দে সঙ্গতি রক্ষা করে।

তাহাই যদি হয় তাহা হইলে শব্দকে 'কর্ত্তা' 'কর্ম্ম' 'অপাদান' 'সম্প্রদান' ইত্যাদি বিশ্রী ও বিদ্‌ঘুটে কারকে ভাগ করার অর্থ হয় না।

'শেয়ালটি উড়িতেছে'—বাক্যটিতে কর্ত্তা, ক্রিয়া ইত্যাদি সুবিন্যস্ত : অথচ উহার অর্থ হয় কি ?

'তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তে ভাণ্ডার হইতে ধন দিতেছেন।'

এখানে 'দিতেছেন' কথার নানা 'সম্পর্ক' বা 'আত্মীয়তা'র পরিচয় প্রায় যে কেহই দিতে পারিবে :

কে দিতেছেন ? রাজা।
কি দিতেছেন ? ধন।
কিসের দ্বারা দিতেছেন ? স্বহস্তে।
কাহাকে দিতেছেন ? দরিদ্রকে।
কোথা হইতে দিতেছেন ? ভাণ্ডার হইতে।
কোথায় দিতেছেন ? তীর্থক্ষেত্রে।

অথচ 'কর্ত্তা' 'কর্ম্ম' 'করণ' 'সম্প্রদান' 'অপাদান' 'অধিকরণ' ইত্যাদি নাম বানাইয়া 'পরিষ্কার জলকে ঘোলাটে' এবং 'সাধারণ ছেলেটাকে' 'নাতিদীর্ঘখর্ব্বকৃষ্ণধবল' বলা হইয়াছে।

খালি 'অধিকরণ' শিখিলে পরীক্ষায় পাশ করা যাইবে না !
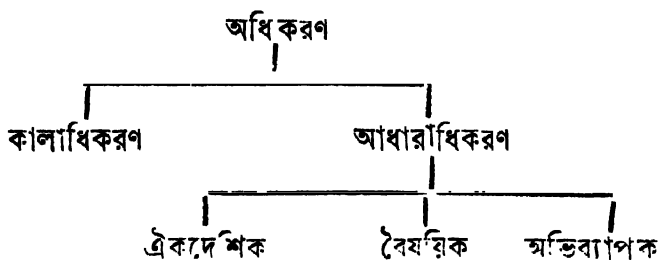
এই বিশাল বৃক্ষটীকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে !

'কালাধিকরণ'কে আবার যে, 'রাত্রিকালাধিকরণ,' 'দিবা-কালাধিকরণ'— 'প্রাতঃ—', 'সান্ধ্য— কালাধিকরণে' ভাগ করা হয় নাই তাহাই রক্ষা ! 'মামা'কে 'মমপিতৃ-শ্যালক' বা 'মমমাতৃভ্রাতা' বলা আর কি !

এতগুলি কারক বর্ণনা করিয়া যদি ইহাই দেখানো **হয়** যে, **প্রয়োগে** এটার শেষে ওটা বসে বা এটা সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে শুধু ইহাই কেন বলা হয় না যে, **বাক্যের বিভিন্ন অংশে বসিলে শব্দের বিভিন্ন রূপ হয়।**

আমি ভাত খাইতেছি।

তুমি ভাত খাইতেছ !

চাকর আমার ভাত খাইতেছে।

এখানে আমি, তুমি, আমার, খাইতেছি, খাইতেছ, খাইতেছে প্রয়োগ করিতেছি **এই রূপই দশজনে প্রয়োগ করে** বলিয়া। তাহাই যদি হয় তবে আমি শিখিব প্রয়োগ দেখিয়া ; শুধু এক গাদা ধারা উপধারা আমার সম্মুখে ধরা অনর্থক।

'দশজনে করে যাহা আমিও করিব তাহা' ইহাই হইবে আমার দোহাই। তবে একটা ক্ষীণ আশা থাকে এই বলিয়া যে, আমি যাহা করি তাহা দশজনেও যদি করে তবে যুক্তির অবকাশ ও মুক্তির প্রয়াস থাকে।

(৩) **অর্থ বজায় রাখিয়া ছোট বাক্যকে বড় করা যায়।**

এটা একটা সোজা কথা। ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই আপনা হইতেই ছোট বড় বাক্য গঠন করিয়া প্রয়োগ করে।

'আমি ভাত খাইতেছি।'

'আমি চেয়ারে বসিয়া গরম ভাত খাইতেছি।'

'আমি এখন আরও বহু লোকের সঙ্গে একত্র বসিয়া গরম ভাত এবং মিষ্টান্ন খাইতেছি।'

অর্থ বজায় রাখিয়া এইরূপ বাক্যের সম্প্রসারণ সকলেই করে। যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা শুনিয়া শুনিয়া এইরূপ করিতে শিখে। যাহারা জানে তাহারা শুনিয়া এবং লিখিত প্রয়োগ দেখিয়া এইরূপ করে।

বাক্য বড় হইতে থাকিলেও বক্তাকে অর্থ দেখিয়া তাল সামলাইতে হইবে।

(৪) বাক্যের শক্তি বর্দ্ধন ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন অর্থাৎ উহাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রকাশ করা রুচিসাপেক্ষ।

শব্দের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, উহার সুষ্ঠু বিন্যাস, বাক্যের শক্তিবর্দ্ধন ইত্যাদি নানা প্রকারে সাধিত হয়।

তুলনা, বিরোধ, বৈচিত্র্য ইত্যাদি দর্শাইয়া কথার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হয়। যথা:

'তিনি ভীমের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।'

'তিনি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন।'

'তিনি বিদ্যুৎবেগে সরিয়া পড়িলেন।'

মোট কথা, কোথায় কোন্ ভাল শব্দ বসিবে তাহা কান বা চোখ নির্দ্দেশ করিবে। এই ভাবে রুচি গড়িয়া উঠিবে।

ভাষা বাক্যের সমষ্টি লইয়া। ভাবধারা বাক্যের সমষ্টি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এই প্রকাশ সুন্দর বা বিশ্রী, জোরালো বা কমজোর হইতে পারে; অনেক ক্ষেত্রেই **ভাব** ও **প্রকাশ** সমপর্য্যায়ে হয় না। শব্দবিন্যাসের দুর্ব্বলতাই অধিক ক্ষেত্রে এর জন্য দায়ী।

ভাব প্রকাশের সুষ্ঠু ধারা আয়ত্ত করিতে হইবে অপরের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া।

এইজন্য **সৎসঙ্গ** বা **উন্নত সাহিত্য পাঠ** ভাষা উন্নত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

(৫) বাক্যের পদগুলিকে শ্রুতিমধুর করিয়া সাজাইয়া ছন্দোবদ্ধ করা হয়।

এই ছন্দের মাপ, প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। যে মাপ বা তালে পূর্ব্বের কবিগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই অনুসরণ করা হয়। আবার অন্যান্য গোষ্ঠীর রচনাপদ্ধতি অবিকল বা পরিবর্ত্তিত করিয়া অবলম্বন করা হয়। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইংরেজী হইতে এবং নজরুলের গজলগীতিকার অনেক ছন্দ আরবী হইতে ধার করা। ফারসী, উর্দ্দুর ছন্দের রীতি প্রধানতঃ আরবী হইতে ধার করা।

প্রতিভাবান কবিরা আবার নিজেরাই নূতন ছন্দে লিখিয়া উহার প্রচলন করেন। এক্ষেত্রেও সাধারণের রুচি আস্তে আস্তে

গড়িয়া উঠে। গদ্য কবিতাও ইদানীং প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

প্রায় সকল ভাষায়ই দেখা যায়, কাব্য ও কবিতা যত পুরাতন কালের পাওয়া যায়, গদ্য ততটা পাওয়া যায় না।

ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, লেখার প্রচলন কম থাকায় শ্রুতিমধুর কাব্য বা কবিতাই লোকে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে; এবং লোকপরম্পরায় উহা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। মানুষের সাময়িক ভাবপ্রকাশ সাময়িক কাজেই লাগিয়াছে; উহা ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস লোকে পায় নাই।

-৬-

লিখনের প্রবর্ত্তন

বর্ণমালা ও বানান

আমি এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহা মনোভাব ব্যক্ত করার সাধারণ ভাষার রূপ। মানুষ কথার সাহায্যে ভাববিনিময় করিয়াছে পূর্ব্বাপর লক্ষ লক্ষ বৎসর। কিন্তু লিখিতে শিখিয়াছে বহুকাল পরে।

উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মনোভাব বিনিময় করার যেমন কতগুলি সুবিধা আছে, লিখিত কথার সাহায্যে উহা করারও কতগুলি সুবিধা আছে।

অনুপস্থিত লোককে কিছু বলিয়া পাঠান, পরবর্ত্তী লোকেদের জ্ঞাতার্থে কিছু রাখিয়া যাওয়া, পরে মনে করিবার মত কিছু নির্দ্দেশ করা—ইত্যাদি লিখনের সাহায্যে সম্ভবপর হয়। এই সকল সুবিধা প্রাচীন কালের লোকদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার পরেই বোধ হয় খুদিয়া, আঁকিয়া, বা অন্য কোনও প্রতীকের সাহায্যে দৃশ্যমান ভাবপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চিত্রলিপি (pictogram), ভাবলিপি বা প্রতীক লিপি (Ideogram) চোখে দেখা আকার বা গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতগুলি ধ্বনি পাই। এই সমস্ত ধ্বনিকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা চোখের সম্মুখে প্রকট করিয়া দেওয়াকে ভাষার লিখনপ্রণালী বলা যায়।

ধ্বনির সাঙ্কেতিক চিহ্নকে বর্ণ বলে। বাংলা ভাষার বর্ণমালা ব্রাহ্মীলিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, বর্ণমালায় বাহুল্য এবং লিখিবার প্রণালীতে জটিলতা থাকার দরুণ আমাদের কতগুলি অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

এই সকল অসুবিধার মোটামুটি নাম :

বানান সমস্যা।

বাংলা ভাষার বানান সমস্যার সমাধানের যে **প্রয়োজন** আছে তাহা বিজ্ঞমণ্ডলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বহু লেখক এ সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উদ্দেশ্যে সাধু প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে কতকটা সুফলও হইয়াছে। আমিও **ইঁহাদেরই অনুগামী; আমারও আগ্রহ ঐ প্রচেষ্টাকে পূর্ণতাদান।**

'চলন্তিকা' অভিধানের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহোদয় স্বীকার করিয়াছেন : "ই-ঈ, উ-ঊ, ং-ঙ, ণ-ন, শ-ষ-স প্রভৃতি বর্ণ লইয়া বিভ্রাট হয়।"

আমরাও এই অভিমতের পূর্ণ পরিপোষক। শুধু বিভ্রাট হয় বলিলে অল্পোক্তি হয়; **মস্তিষ্কের উপর রীতিমত অত্যাচার** হয়। কয়েকখানা বহি লিখিবার পরেও আমাকে যে বারে বারে অভিধান খুলিতে বাধ্য হইতে হয় ইহা অপেক্ষা বিরক্তিকর আর কি হইতে পারে? ইহা হইতে অনুমিত হইবে, শিশুদের বানানশিক্ষা কত প্রমাদজনক। বস্তুতঃ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ঐ **সঙ্কটময় পরিস্থিতির** কথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

আমি পূর্ব্বগামীদেরই অনুসরণ করিয়া নিবেদন করিব, **বানান সমস্যার সমাধান অসম্ভব** ত নহে-ই, এমন কি **দুঃসাধ্যও নয়। সাধারণ জ্ঞান, তুলনামুলক পর্য্যবেক্ষণ, বিচার-বিবেচনা সম্বলিত নির্ভীক সংস্কার প্রচেষ্টা** দ্বারা আমরা **অনায়াসে** মাতৃভাষার এই সামান্য দোষত্রুটি দূর করিতে পারিব। ইহা শুধু মাতৃভাষাকে **শ্রদ্ধা** করি বলিয়া; **অবজ্ঞা** করি বলিয়া নহে।

সুনিয়ন্ত্রিত ও **সুযুক্তিপূর্ণ** কোনও **প্রণালী** না থাকায় বিভিন্ন লেখকের 'বলল,' 'বোলল,' 'বললো,' 'বল্লো,' 'বোল্লো,' 'বোল্লে' লিখিবার রীতি দেখিয়াই ইহা প্রতীয়মান হইবে। এইরূপ অন্যান্য শব্দ লেখনের বৈচিত্র্যও বাস্তবিকই পীড়াদায়ক।

আমার উদ্দেশ্য **যথেচ্ছাচারকে** প্রশ্রয় দেওয়া নহে; **সুযৌক্তিক প্রণালীপ্রবর্ত্তন।**

আমার মতে :

(১) **বাংলা বর্ণমালা হইতে অনাবশ্যক অক্ষর উঠাইয়া দিতে হইবে।**

স্বরবর্ণে—অ, অ্য, আ, ই, উ, এ, ও—এই কয়টীই যথেষ্ট।

ডঃ সুনীতিকুমার তাঁহার "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ"এ এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন :

"বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বর বর্ণের সংখ্যা ১৩টী (ঌ কে ধরিলে চৌদ্দটী), কিন্তু **সাধু ও চলিত বাঙ্গালার** বিভিন্ন ও বিশিষ্ট **স্বর-ধ্বনি** (কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রভাষায়) মাত্র এই সাতটী :

[**অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা, ও**]।"

আমি এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত **সম্পূর্ণ একমত।**

এ্যা উচ্চারণটী অনেক স্থলেই হয় বলিয়া শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু বাংলায় ঐরূপ একটী **এ্যা-কার** উচ্চারণ বিশিষ্ট স্বরবর্ণের যোগ করিবার পক্ষপাতী।

ইঅ (য়) অক্ষরটীর যোগে এই উচ্চারণের সহায়তা করা যায়, যথা : ব্য়ায়, ত্য়াগ, ন্য়ায়। কিন্তু এ্যা উচ্চারণটীর প্রচলন এত বেশী যে এইরূপ করিতে গেলে শ্রমবৃদ্ধির কারণ হইয়া পড়িবে।

আমার মতে, অ এবং আ-র মধ্যে অ্য যোগ করিয়া দেওয়াই ভাল। যথা, অ্যামেরিকা, ম্যনেজার, প্যসেঞ্জার, ব্যং ইত্যাদি। একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে ্য-কারের পরে আর া-কার দেওয়ার দরকার হইবে না।

ইহাতে ব্যক্তি, ব্যাপ্তির ঝগড়া একেবারে উঠিয়া যাইবে।

ত্যাগ, ন্যয়, ব্যক্তি, ব্যয়, ব্যপার, সবগুলি সমান হইবে ; সন্দেহ বা দ্বিচারণের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইবে।

ঈ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, ঐ, ঔ—এই কয়টী অনাবশ্যক

বর্ণবাহুল্য

ঈ, ঊ ঃ—দীর্ঘ ধ্বনি প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া ইহাদের খানিক উপযোগিতা থাকিলেও ইহারা দারুণ বিভ্রাটের সৃষ্টি করে। ঈশ্বর, ঈর্ষা এবং ঊর্দ্ধ, ঊণ প্রভৃতি চলতি কথা ছাড়া আর কয়েকটী মাত্র অল্প ব্যবহৃত কথা এই দুইটী অক্ষর সম্বলিত। শ্রদ্ধেয় সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে ঐ দুইটী অক্ষর দেখিলেই আমার মন্তব্যের সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। 'চলন্তিকা'য় ঈ সম্বলিত মাত্র ১৪ এবং ঊ সম্বলিত ১৩টী শব্দ দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইশ্বর, ইর্ষা লিখিলে কি যে ক্ষতি হয় তাহা বলা যায় না।

ইহা ছাড়া, দীর্ঘ ঈ এবং ঊ-কার যে কত বড় বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাড়ী, হাতী, নদী ইত্যাদিতে হ্রস্ব ই-কার অথবা দূর, মূল, সূত্র ইত্যাদিতে হ্রস্ব উ-কার দিলে যে কি ক্ষতি হইত তাহা বুঝা মুশকিল।

যদি বলা হয়, 'টানিয়া পড়া' বা 'দীর্ঘ ধ্বনি' করা হয় বা হওয়া উচিত বলিয়া (ী) বা (ূ) চিহ্নের দরকার হয়, তাহা হইলে বলিব, এই সব ক্ষেত্রে **দীর্ঘ ধ্বনি কার্য্যতঃ করাই হয় না।** যদি হইত তাহা হইলে বিভ্রাটেরও কোন অবকাশ থাকিত না। 'নদীর জল' এবং 'দধির সর' বলিতে আমরা কি যে পার্থক্য করি তাহা বুঝা কঠিন।

দীর্ঘধ্বনি একেবারে করিতে হয় না তাহা বলিতেছি না। বক্তৃতায় বা কথোপকথনে অনেক সময়ে গুরুত্ব (emphasis) দিতে গিয়া আমরা ই, উ ছাড়া অন্য অক্ষরকেও দীর্ঘ আকার দিতে পারি এবং দিয়া থাকি।

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, এম্. এ. পি. এইচ. ডি—ইকারেরই বা আকারেরই যে দৈর্ঘ্যের কত তারতম্য হইতে পারে তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যেমন কী (কোন জিনিষ) খাবে? এখানে 'কী'র দীর্ঘ ঈ উচ্চারণের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। এতদনুসারে 'কী ী আশ্চর্য্য!,' 'কী ী ী, এত বড় কথা'! এরূপ লেখা উচিত। এরূপ স্থলে গাণিতিক সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া কী১, কী২, কী৩ ইত্যাদি লেখা যাইতে পারে। ক্রোধের মাত্রানুসারে কী৭, কী৮, প্রভৃতিও আবশ্যক হইতে পারে। বক্তা তোৎলা হইলে কী২০ পর্য্যন্ত আবশ্যক হওয়া অসম্ভব নহে। 'হাঁ' শব্দটী উচ্চারণের সময়ে সকলের মুখ সকল সময়ে সমপরিমাণে ব্যাদিত হয় না। সুতরাং মুখব্যাদানের পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য হাঁ১, হাঁ২ প্রভৃতি লেখা যাইতে পারে। এইরূপ লিখনরীতি আপাততঃ মনোহর মনে হইলেও নিতান্তই অনাবশ্যক। কারণ সাধারণ লেখা গানের স্বরলিপির ন্যায় না হইলেও ক্ষতি নাই।" *

* যাঁহারা কবিতার ছন্দ, মাত্রার দোহাই তুলিবেন তাঁহাদের কাছেও জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মন্তব্যটী পেশ করিব। কবিতা বা গানের স্বরলিপিতে প্রদর্শিত টানাটানি শ্রুতিমধুরতা আনিবে। ধরাবাঁধা ছন্দ মাত্রা ছাড়া বিদেশীর অনুকরণে বা নিজেদের আবিষ্কারে বহু প্রকার ছন্দ মাত্রার প্রচলন হইয়াই পড়িতেছে। ইংরেজীতে হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরবর্ণের বালাই কবিতায় গ্রাহ্য নয়। আরবী, ফারসীতে আ, ই, উ ছাড়া স্বরবর্ণই নাই; কয়টী স্বরান্ত অক্ষরের পরে হসন্তযুক্ত অক্ষর আসে।

"বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ"—গ্রন্থে প্রোফেসার নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এ সম্বন্ধে জোরালো মন্তব্য করিয়াছেন :

"ই-কারের দীর্ঘ, ঈ-কার। সংস্কৃতে এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও বাঙ্গালায় ঈ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব কেবল নামে ও লেখনেই ইহার অস্তিত্ব। বাঙ্গালায় ইতর এবং ঈষৎ এর 'ই' ও 'ঈ' উচ্চারণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না, কেবলমাত্র তৎসম শব্দে দীর্ঘ স্বরের প্রয়োজন : অন্যথা **বাঙ্গালা ভাষা হইতে দীর্ঘ স্বরের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে শিশুদের পক্ষে মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করা অনেকটা সহজ হইত এবং গুরুমহাশয়দের চপেটাঘাত বা বেত্রাঘাত হইতে উহারা কতকটা নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিত**।··· উকারের দীর্ঘ ঊ-কার। বাঙ্গালায় উভয়েরই, হ্রস্ব উচ্চারণ। 'উপমা' এবং 'ঊনিশ' শব্দের 'উ' ও 'ঊ'র উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই।"

আমরা ঈ এবং ঊ অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং দিব।

ঋ—অনাবশ্যক। স্বরবর্ণে ইহা স্থানই পাইতে পারে না উহার কাজ রি দিয়া অনায়াসে চালানো যায়—যথা : রিশি, রিন ইত্যাদি। ঋ-সম্বলিত কথা 'চলন্তিকা'য় দেওয়া হইয়াছে ১৩টী; তাহারও কয়েকটী আবার খুব কমই প্রচলিত।

নগেন্দ্রনারায়ণ এক্ষেত্রে বলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় ঋ-কার ও র-কারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব; এজন্য উভয়ের উচ্চারণে বড় গোলমাল হয়। আমরা ঋ-কারের উচ্চারণ ঠিক মত করিতে পারি না। আমরা লিখি 'ঋতু' কিন্তু উচ্চারণ করি 'রিতু'। কেবল বাঙ্গলায় নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই ঋ-কারের উচ্চারণে এইরূপ গোলমাল হইয়াছে।"

এই গোলমালের উচ্ছেদেরই প্রস্তাব আমি করিতেছি।

কথা হইবে ঋ-কার (ৃ) লইয়া। ৃ-কারের ব্যবহার প্রচুর। কিন্তু যখন ু বা ূ। বা ে ু। কারের জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র সরল চিহ্নের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তবে শুধু ি ু কারের জন্য একটী করিয়া লাভ কি? আমি ঋ অক্ষর উঠাইয়া রি ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। (ৃ)কার, ্র-ফলা। এবং (´)রেফ উঠাইয়া দিবার অন্য প্রস্তাব পরে করিতেছি। হসন্তের পরে 'র'কে বসাইয়া বা 'র'তে হসন্ত দিয়া ইহা সাধন করিতে হইবে। প্‌রিয়, প্‌রায়, পুর্‌ব ইত্যাদি লিখিতে খুব সুবিধা।

ঋ-৯ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই দরকার নাই। উহারা **একেবারে অনাবশ্যক**।

ঐ-ঔ—এই দুইটী অক্ষরের প্রচলন অক্ষর হিসাবে কম। মাত্র কয়েকটী। তবে ৈ এবং ৌ কার হিসাবে বেশী। কিন্তু এ দুটীকে উঠাইয়া দিয়া অই, ওই, অউ, ওউ দিয়া অনায়াসে কাজ চালান যাইবে। দৈ, দই, খৈ বা খই কোনটাই বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ 'এ'র পর 'ঐ'এর উচ্চারণ 'ওই' কি করিয়া হইল তাহা বুঝা শক্ত। উহা বরং 'এই' হইতে পারে। 'ওই' উচ্চারণের ন্যায্য স্থান 'ও'র পরে এবং উহার 'ও'র মত আকার পাওয়া উচিত ছিল।

আমাদের কথা হইবে, যদি **অল্প অক্ষর রাখিয়া যুক্ত করিয়া অল্পব্যবহৃত স্বতন্ত্র একটা অক্ষর বাদ দেওয়া যায় তবে দিব না কেন?** ঐ ঔ রাখিলে আবার আউ, আই, আয়, এই—উচ্চারণাত্মক অক্ষর স্বতন্ত্র থাকিবে না কেন? **স্বতন্ত্র অক্ষর থাকিবে এমনতর যেন দুইটীর মধ্যে বিভ্রাট উপস্থিত না হয়**—অর্থাৎ উহারা **কার্য্যতঃ, দৃশ্যতঃ একেবারে স্বতন্ত্র** থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে আ-কার, ই-কারের রূপও বিবেচ্য। প্রচলিত প্রথায় ি, ে, ো লিখিতে বা দিতে বাম দিকে আসিতে হয়। মুদ্রণ, টাইপরাইটিং ইত্যাদিতে ইহাতে অসুবিধা হয়।

আমার মতে, **ইহার সবগুলিই ডাইনে বসা উচিত।**

আবার **সবগুলিই পৃথক হওয়া উচিত।**

আমাদের গৃহীত কম অক্ষরের জন্য আ-কার, ই-কারও কম হইবে। আমি উপরোক্ত 'কার' গুলি এইরূপ লিখিবার পক্ষপাতী :

যথাঃ ক, ক্য, কা, কী, ক), ক()

আমাদের দ্বিতীয় সূত্র হইবে :

(২) স্বতন্ত্র অক্ষর থাকিবে এমনতর যেন দুইটীর মধ্যে বিভ্রাট উপস্থিত না হয় : দৃশ্যতঃ ও কার্য্যতঃ উহারা বাস্তবিকই স্বতন্ত্র হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মূলসূত্র ধরিয়া আমি ব্যঞ্জন বর্ণেও কয়েকটী অক্ষর বাদ দিলাম :—যথা ঙ, ঞ, ণ, য, ব, ষ, স, ক্ষ, ঢ়, ৎ। ইহারা **অনাবশ্যক** এবং **বিভ্রাটসৃষ্টিকর**। স্বরবর্ণ বিচারে আমি যেরূপ যুক্তি দিয়াছি এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ যুক্তি দেওয়া যায়।

তাহা হইলে ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়াইবে :—

ক	খ	গ	ঘ
চ	ছ	জ	ঝ
ট	ঠ	ড	ঢ
ত	থ	দ	ধ
প	ফ	ব	ভ
ন	ম	য়	*হ
র	ড়	ল	শ

*(=**ইঅ ; অয়**)

বর্ণগুলি এ ক্ষেত্রে সাজানো হইয়াছে চারিটী করিয়া। পড়িবার সুবিধা হইবে। একেবারে শেষের ল, শ ছাড়া আর সকলগুলিই যথাসম্ভব স্বগোত্রে স্থান পাইয়াছে। এই ভাবে সাজানো আমার মতে বেশী যুক্তিযুক্ত।

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর ইহারও এক ধাপ আগে অগ্রসর হওয়া যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: হ যোগ করিয়া ক+হ=খ, গ+হ=ঘ, চ+হ=ছ ইত্যাদি ইংরেজীর k+h, g+h এর মত বানানো যায়। তাহা হইলে বাংলা বর্ণমালা একেবারে কয়েকটীতে মাত্র দাঁড়ায়।

তবে মুশ্‌কিল এই যে খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি ধ্বনির ব্যবহারও বাংলায় খুব বেশী। অক্ষর সংক্ষেপে আবার শ্রমবাহুল্য ঘটিবে। ইংরেজীতে খ, ছ উচ্চারণ কম বলিয়া kh ও chh দিয়া চালানো হয়।

ঙ, ঞ, ণ, য. ব, ষ. স, ক্ষ, ঢ়, ৎ—এই কয়টী অনাবশ্যক বলিয়া বাদ দেওয়া হইল।

ঙ, ঞ খুব কম ব্যবহৃত হয়। ং এর সঙ্গে উপযুক্ত বর্ণ যোগে ঙ-এর কাজ চালানো যায়। যথা: বংগ, রং, রংগের, সংগ। ঞ-এর জন্য বিশেষ মাথা ব্যথা করিয়াই লাভ নাই। লাঞ্ছিত, বঞ্চনা—লান্‌ছিত ও বন্‌চনা লেখা যাইবে।

ন, ণ—দুই নয়ে উচ্চারণে তফাৎ খুবই কম। অথচ ব্যবহারে পার্থক্য করা ভারী কঠিন।

জ, য—জ, য, দুইটী থাকা প্রমাদকর। জল, জ্বালা, জঙ্গল বলিতে আমরা সাধারণতঃ যে জ ব্যবহার করি উহা থাকিলেই হইবে। জ-এর ব্যবহার অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু লাগিলেও পূর্ব্বে 'দুলি

ছুহি পিটা ধরণ না **জা**এ'—'সাচন উড়য়ে **জেন** গগন উপরে,' 'বুড়া **জো**গি পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল' ইত্যাদিতে জ ব্যবহৃত হইত। আমরা অনায়াসে অভ্যস্ত হইয়া যাইব। য-এর প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ 'ইঅ' : বাংলায় দাঁড়াইয়াছে একেবারে জ। আমি য় (ইঅ) রাখিয়া য উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী।

ব, ব—একটী ব-ই যথেষ্ট।

শ, ষ, স—ইহাদের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ তফাৎ থাকিলেও ব্যবহারবিভ্রাট মস্ত। সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে শ, ষ, স তিনটী একই রকম শোনায়। সেই জন্য ও সুবিধার জন্য আমি মাত্র শ রাখিলাম।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও "ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণে" মন্তব্য করিয়াছেন :—

"উষ্মবর্ণ—[শ, ষ, স] এই তিনটি উচ্চারণে এখন বাংলায় এক হইয়া গিয়াছে; তিনটিই তালব্য [শ]য়ের মত উচ্চারিত হয়।"

'স্নেহ' 'স্মৃতি' ইত্যাদিতে স-এর যে 'ছ'র মত উচ্চারণ হয়, 'শৃগাল,' 'শ্রী,' 'শ্রম,' 'বিশ্রাম' ইত্যাদিতেও শ-এর ঐরূপ উচ্চারণ হয়। সুতরাং শ দিয়া সকল কাজই সম্পন্ন হইবে। 'ইছলাম,' 'মুছলমানে' ফিরিয়া যাওয়ায়ও আপত্তি নাই।

ক্ষ—ক ও ষ এর যুক্ত আকৃতি। সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ ঠিক Ksh ক্ষ এর মতই হয়। কিন্তু বাংলায় উহা ক্খ এর মত উচ্চারিত হয়। জ্ঞ, ক্ত বা ঙ্গ-কে যখন আমরা ভিন্ন বর্ণ বলিয়া ধরি না, ক্ষ-কেও ধরিয়া লাভ নাই। আমার মতে শিক্খা, খমা, খান্ত, লখা,

খতি, লিখাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক। অবশ্য পরবর্ত্তী এক সূত্রে শিক্ষা, খান্ত, লখ্য—শিক্‌খা, খান্‌ত ও লক্‌খ রূপ পাইবে।

ঢ়— ইহা ড় ও হ এর উচ্চারণ সম্বলিত। ড়্‌হ দিয়াই উহার কাজ করা যাইবে। যথা :—দৃড়্‌হ, মুড়হ। প্রচলনও খুবই কম। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "[ঢ় . ইহার (ড় এর) মহাপ্রাণ-রূপ [ড়+হ=ঢ়]"।

আমার মতে সোজাসুজি দৃড়, মুড় বলাই ভাল।

ৎ—ইহা **একেবারে** অনাবশ্যক।

অবশ্য নূতন পদ্ধতিতে সংকলিত 'প্রথম ভাগে' বর্ণমালার পরিচয় দিতে গিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত এই অনাবশ্যক অক্ষরগুলিও পাদটীকায় উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, নূতন মতে মুদ্রিত সাহিত্যের প্রচলন আস্তে আস্তে হইবে। পুরাতন পদ্ধতিতে মুদ্রিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে তাহা না হইলে অসুবিধা হইবে।

ইহাতে ডবল মেহ্‌নতের ভয় যাঁহারা করেন তাঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক তাহা সপ্তম অধ্যায়ে নিবেদন করিতেছি।

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ব্যাকরণে 'ধ্বনিতত্ত্ব' শীর্ষক আলোচনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কাটাইয়া দেওয়ার এবং দন্ত, তালু, জিহ্বা, গলার নানা স্তর, ভাঁজ, খাঁজ, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখাইবার বদভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। ছেলেমেয়েদের সামান্য সামান্য উচ্চারণত্রুটী গুরুজন, শিক্ষক শুদ্ধ করিয়া দিবেন। ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য

উপদেশ দেওয়া নিরর্থক ও বিড়ম্বনাময়। গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া বরং যুক্তিসঙ্গত।

মাত্রাবাহুল্য

বাংলা অক্ষরমালার কোনও কোনওটার মাত্রা নাই; বেশীর ভাগেরই আছে। এই মাত্রাবিভ্রাটের উচ্ছেদ করা দরকার। মাত্রা একেবারে উঠাইয়া দিয়া অক্ষরগুলি বসাইবার পক্ষে সুবিধা অসুবিধার বিচার করিবার ভার আমি ছাপাখানার মালিক ও টাইপমেকারদের উপর দিতেছি।

চিহ্নবাহুল্য

ং—সংস্কৃতে ইহা স্বরবর্ণের আশ্রয়ে বসিয়া উহাকে আংশিক ভাবে 'সানুনাসিক' করিত। ং বাংলায় ঙ-এর সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ায় আমি ঙ কে উঠাইয়া দিয়া ইহাকেই রাখিবার পক্ষপাতী।

:—ইহাও অনাবশ্যক। একেবারে বাদ দিলেও অনেক ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতি হয় না। যথা: পুন, দুস্থ. নভ. ক্রমশ।

'নিঃশেষ' প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী অক্ষরের দ্বিত্ব করিলেই হইবে। এইরূপ দ্বিত্ব করার আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে। (৫নং সূত্র দ্রষ্টব্য)।

সানুনাসিক স্বর— ँ ইহাকে উঠাইয়া দেওয়া যায়। ইহা বাস্তবিকপক্ষে কোন বর্ণবিশেষ নয়; চিহ্ন বিশেষ। অষ্ট হইতে আট, হস্ত হইতে হাত, সপ্ত হইতে সাত যেমন সোজাসুজি আসিয়াছে

পঞ্চ হইতে পাচ এবং হংস হইতে হাস আসিলে কোনও ক্ষতি হওয়া উচিত নহে।

বহু ভাষায় সানুনাসিক স্বরধ্বনি নাই : ইংরাজী ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গে বহু স্থলে এইরূপ স্বর অজ্ঞাত।

যাঁহারা ঐ স্বরবোধক চিহ্ন দিবেনই, তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত অক্ষরের লোপ বুঝাইবার চিহ্ন 'ইলেক' (') ব্যবহারই যথেষ্ট।

কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এই বলিয়া যে, পশ্চিম বঙ্গে যে সানুনাসিক উচ্চারণ আছে তাহার নির্দ্দেশক চিহ্ন না থাকিলে উচ্চারিত ও লিখিত শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবে কি করিয়া?

কথা হইবে, পূর্ব্ববঙ্গে যে ঐরূপ উচ্চারণ করে না, (ঁ) প্রয়োগ করিলে আবার পূর্ব্ববঙ্গীয় সকলের উপরে উগা চাপাইয়া দেওয়া হয় না কি?

পেঁচা, জুঁই, কাঁচ প্রভৃতিতে অযথা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানে দিয়েঁ, যেয়েঁ, খেয়েঁ প্রভৃতি উচ্চারণও সিদ্ধ।

আমার মতে, যাঁহারা ঐরূপ চিহ্ন দিবেনই তাহারা (') ব্যবহার করুন। যাঁহারা বাদ দিতে চান তাঁহারা বাদ দিন।

সম্ভ্রমাত্মক (ঁ) ব্যবহারে আবার আর এক মুশকিল হইয়াছে। ইংরাজীতে পাপাচারী দুর্ব্বৃত্ত হইতে যীশুখ্রীষ্ট, সম্রাট, প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলের জন্যই He বা They কথা ব্যবহৃত হয়। আরবী, ফারসীতেও পয়গম্বর ও শয়তান উভয়ের জন্য "বলে, করে, যায়" ইত্যাদি বলা হয়। অথচ "তিনি, তাঁহারা,

যাঁহারা, কাঁহারা" ইত্যাদির প্রচলনে আমাদের অনাবশ্যক শ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে।

সম্ভ্রমের কথা তুলিলেই উহা বাড়িয়া চলে। **গুরুজনের** নিকট পত্র লিখিতে "সম্মান পুরঃসর পাদপদ্মে নিবেদন" করিবার রীতি আজকাল অচল। **কর্ম্মব্যস্ত** জগতে বাহুল্যের অবকাশ নাই। বাবা, দাদা, বন্ধু সকলেই 'প্রিয়' সম্ভাষণেই সন্তুষ্ট।

যাহা হউক, এদিকেও **শ্রমব্যয়সঙ্কোচ** করাই উচিত। **চন্দ্রবিন্দু** তুলিয়া দেওয়াটা হবে এদিকে **প্রথম পদক্ষেপ।** 'সভ্যগণ আসিয়াছেন ; তাহারা বলেন'—ইহাই যথেষ্ট।

বিরাম চিহ্ন—(Punctuation)—

ইহার অনেকগুলিই ইংরাজী হইতে গৃহীত। আবার ইংরেজীর দেখাদেখি ইহাতে বাড়াবাড়িও করা হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রণবিভ্রাটও কম নহে।

আমার মতে :

(৩) **বাক্যের অর্থ বুঝিতে কষ্ট না হইলে বিরামচিহ্ন যত কম দেওয়া হয় ততই ভাল।**

কমাবাহুল্য, আজকাল একটা ফ্যাশানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাইফেনবাহুল্যের দোষে মৎলিখিত "যৌনবিজ্ঞানের" মূল সংস্করণে আমিও অপরাধী ছিলাম।

চিহ্নবাহুল্যের একটা **জ্বলন্ত** উদাহরণ বাংলায় ইংরেজীর অনুকরণে (" ") এর ব্যবহার। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী,

তে এই চিহ্নের বালাই নাই অথচ লিখিতে ও পড়িতে কোনই কষ্ট হয় না।

মৌখিক ভাষায় আমরা থামিয়া 'উদ্ধৃতি চিহ্ন এখানে আরম্ভ এখানে শেষ' বলি না। অথচ লিখিবার বেলায় ইহার ব্যবহার যেন না হইলেই হয় না !

শরৎচন্দ্র এবং অন্য কেহ কেহ কমা (,) ও ড্যাসের (—) পরে উক্তি বসাইয়া দেন ; কেহ কেহ কেবলমাত্র 'কমার' পরেই ঐরূপ করেন।

আমার মতে ইহার ব্যবহার যত কম করা যায় ততই ভাল।

খোকা বলিল বাবা বায়স্কোপে যাব। বাবা বলিলেন আজ নয় অন্য দিন। খোকা মায়ের শরণাপন্ন হইল। মা বাবাকে ধরিলেন আজ ওর সঙ্গী জুটেছে, বারণ করো না। বাবা বলিলেন তবে যাও। ইত্যাদি—

বর্ণমালা ও চিহ্নাদির সংস্কারের পরে আমাদের চতুর্থ সূত্র হইবে :

(৪) উচ্চারিত ও লিখিত কথার মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে এবং অনুচ্চারিত বর্ণ লিখিবার দরকার নাই।

ইংরেজীতে Though শব্দ Tho দিয়া অনায়াসে লিখা যায় এবং আমেরিকায় লিখাও হয়। উচ্ছাস, উজ্জ্বল, ধর্ম, কর্ম, কার্য এই পর্য্যায়ে পড়িবে।

এখানে কবিবর রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত আর একটী প্রথার

উল্লেখ করিতে হয়। তিনি গোরু, মতো, ততো ইত্যাদিতে ও-কার প্রয়োগ করিয়াছেন উচ্চারণের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার মানসে।

কিন্তু বাংলাভাষায় এইরূপ ও-কারের দরকার হয় অসংখ্য স্থলে। প্রত্যেক স্থলেই ও-কারের প্রয়োগ কষ্টকর বা শ্রমসাধ্য হইয়া পড়িবে।

আমার মতে, এই সব ক্ষেত্রের সকল ক্ষেত্রেই যে ঠিক সোজা-সুজি ও-কারের মত উচ্চারণ হয়, তাহা ঠিক নহে। বলা যায়, অ হইতে ও-র মধ্যবর্ত্তী নানা ডিগ্রীর উচ্চারণ শুনা যায়; অর্থাৎ অ-টা বাঁকা হইতে হইতে ও-পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে চায়। তবে কেহ যদি 'তত,' 'মত,' 'কাল,' 'ভাল'-র উচ্চারণ অ-কারের মতই করে তাহা হইলেও আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না।

তাই আমি 'ততো,' 'মতো,' 'ভালো,' 'কালো' লিখিবার পক্ষপাতী নহি।

সাধারণ সূত্র হইবে:

(৫) **উচ্চারিত শব্দের সহজতম বানানই গ্রহণযোগ্য।** যথা:—বিদ্দান, পদ্দা, বিশ্শ, বিশ্শাস, বিল্ল, অশ্শ।

য, ম, ব-ফলার **নিজস্ব কোন উচ্চারণ** না থাকিলে **অক্ষর ডবল** করিলেই চলিবে।

ফলা সম্বন্ধে এখানে একটু বলা দরকার। আমাদের শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অবিবেচনার পরাকাষ্ঠা দেখা যাইবে **বাল্য শিক্ষা** সিরিজের কুখ্যাত **দ্বিতীয় ভাগে**।

ফলা জোর করিয়া মাথায় ঢুকাইতে গিয়া লেখকদের বাধ্য হইয়া এমন সব উদাহরণ আনিতে হয় যাহা শিশুদের বোধশক্তির **একেবারে বহির্ভুত।** মজা এই যে, ঐ সব শব্দের অনেকগুলি **বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত** আর **শুনিতে, বলিতে** বা **ব্যবহার করিতে** হয় না।

যথা : (১) "অর্শোঘ্ন, কর্কটি, ঘূর্ণ নির্ঝরের ধারে
হইতেছে কর্ষকের আদর্শ খামারে।
(২) কুট্টলের চেয়ে বেশী বাগ্মীর সম্মান,
জীবাত্মা বিস্মিত, কেন ভস্ম এ শশ্মান।
(৩) দ্বিদল ও শীম্বী, তুম্বী, কদম্বকেশর
শ্বেত ডিম্ব অন্বেষিবে কৃষক চত্বর।"

কেবল বর্ণমালা যাহারা আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই সকল শব্দ আয়ত্ত করা যে কি কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা শিক্ষাবিভাগের সমীপে "দ্বিতীয় ভাগ" একেবারে উঠাইয়া দিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই প্রসঙ্গে জানাইতেছি।

আমাদের প্রস্তাব, **ফলা** বলিয়া কোন কথা থাকিবে না। অক্ষরে অক্ষরে **যুক্ত হইবার কথা** এবং কাজ থাকিবে মাত্র।

তাহা হইলে সকল সমস্যার সমাধান হইবে আমাদের পরবর্ত্তী সূত্রে :

(৬) সংযুক্ত অক্ষর বুঝাইবার জন্য অক্ষরগুলি পাশা-পাশি রাখিয়া প্রয়োজন মত হস্‌চিহ্ন বসাইলেই চলিবে।

কল্‌প (কল্প), সত্‌ত (সত্ত), এই পর্য্যায়ে পড়িবে।

যেখানে গণ্ডগোলের আশঙ্কা নাই, সেখানে হসন্ত না দিলেই চলিবে। যথা:—চিনতা, কিনতু, জনতু।

হস্‌চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের নিম্নে বসাইলে, অ-কারের লোপ বিজ্ঞাপিত হয়। সুতরাং স্‌টেশনকে সটেশন পড়িবার কোন কারণ থাকিবে না।

এখানে **হসন্তের বাহুল্য** ঘটিবে বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। আমার নিবেদন, **প্রথম প্রথম** একটু হসন্ত বেশী দিতেই হইবে; পরে আস্তে আস্তে উহা কমাইয়া ফেলিলেও পড়িতে কষ্ট হইবে না। আরবী, ফারসীতে স্বরবর্ণ বা স্বর চিহ্ন আকার ওকার না দিয়াই লিখিবার প্রচলন আছে: মসলম (Mslm), মনসফ (Mnsf), কফর (Kfr) কে মুস্‌লিম, মুনসিফ, কুফ্‌র পড়িতে হয়; জীবনে প্রথমবার একটু কষ্ট হয় বটে; পরে আর হয় না। Put, but, pureএ u-র উচ্চারণ সম্বন্ধেও একই কথা খাটেই। **পাঠকদের মধ্যে কেহ বা কাঁহারা এই হসন্ত-বাহুল্যের লাঘব বা বর্জ্জন করিয়া কোনও শ্রেয়তর পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে আমি কৃতজ্ঞ হইব।**

তবে একটা কথা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এখন প্রায় প্রতি শব্দে বিকলাঙ্গ শির-হস্ত-পদ-বিকৃত বর্ণমালা এবং বর্ণে বর্ণে জড়ানো, কোঁকড়ানো, ধ্বস্তাধ্বস্তির বালাই আমরা বেমালুম হজম করিয়া যাইতেছি অথচ সোজা, গোটা অক্ষরের পায়ের তলায় দুই তিনটী করিয়া ক্ষুদ্র রেখা পড়িয়া থাকাতেই চক্ষুঃপীড়ার কারণ কি হইতে পারে? *

* শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর পরামর্শ এই যে, হসন্তকে ( ) এই রকম

উপরোক্ত সূত্র দুইটী বাংলাভাষায় যাহাকে **যুক্তাক্ষর-বিভ্রাট** বলে তাহারও সমাধানকল্পে প্রবর্তিত। টাইপ বা মুদ্রণকার্য্যের সুবিধার জন্য অক্ষরে অক্ষরে জড়ানো অক্ষরগুলিকে অনায়াসে স্বতন্ত্র করা যায় এবং **করাই উচিত।**

বাংলাভাষায় দোতলা, তেতলা অক্ষরমালার সন্নিবেশ টাইপ ও মুদ্রণকার্য্যে যে বিঘ্ন ঘটায় তাহা মুদ্রাকরের প্রাণান্তকর। অক্ষরগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া বানাইলে একই অক্ষর সংখ্যায় বাড়াইয়া যুক্তাক্ষরেরও কাজ করা যাইবে। অথচ এখন বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন যুক্তাক্ষর না রাখিয়া উপায় নাই। ইহাতে বাংলায় টাইপ সাজানোর কাজে ইংরেজীর তুলনায় অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী সময় লাগে। এ বিষয়ে টাইপ ও মুদ্রণ যন্ত্রের কলাকৌশল জানা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

না বানাইয়া (্) এই রকম করিয়া বানাইলে অক্ষরের মধ্যে ফাঁক থাকিবে কম। টাইপ প্রস্তুতকারকেরা এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবারই কথা।

তিনিও পরে ধীরে ধীরে শব্দের মাঝে ও পশ্চাতে হসন্ত যথাসম্ভব উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী।

কেহ কেহ ইংরেজীর মত আমাদের অক্ষরগুলিকে ক্ খ্ গ্ এইরূপ মনে করিয়া অ যোগ করিয়া শব্দ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যথা :—ধ্অন=ধন, ম্অন=মন।

ইহাতে মুশ্‌কিল এই যে, আমাদের বাংলাভাষায় অ-ভাগান্ত কথাই বেশী। ঐরূপ 'অ' যোগ করার চেয়ে যেখানে দরকার হসন্ত দিয়া অ লোপ করাই কম শ্রমসাধ্য হইবে।

বাংলা লিনোটাইপ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত অক্ষরের সন্নিবেশ কতকটা সহজ করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত **আনন্দবাজার পত্রিকা** ইহার প্রবর্ত্তক।

শেষোক্ত সূত্র আবার **রূপান্তর বিভ্রাটেরও** অনেকটা সমাধান করিবে। যুক্তাক্ষরের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে **দৈহিক বিকৃতি** হয় তাহা বড়ই পীড়াদায়ক। যথা :—বক্রোক্তি, অন্ত্য, স্তম্ভন, পত্র, গুঞ্জন।

বাংলায় প্রচলিত গু, রূ, শু, ক্র, ত্র, ক্ত ইত্যাদির বিশিষ্ট আকার ছাড়িয়া দিয়া গোটা অক্ষর রাখিয়াই কাজ চালাইতে পারা যাইবে।

'যুক্তাক্ষর বিভ্রাট' ও 'রূপান্তর বিভ্রাট' ইত্যাদি যে ছাপাখানায় কত বড় বিঘ্ন ও অসুবিধা ঘটায় সে সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের জোরালো মন্তব্য আবার পড়িয়া দেখা উচিত। আমি ২২-২৪ পৃষ্ঠায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু সম্প্রতি "বাংলা অক্ষরের সংস্কার" শীর্ষক এক আলোচনায় বলেন,—

"আমাদের বাংলা লিপি সুশ্রী তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (আদর্শ অক্ষরমালার) গুণাবলীর বড়ই অভাব। অক্ষরের জটিল গঠন ও যোজনপদ্ধতির জন্য শিক্ষার্থীকে বিশেষতঃ শিশুকে অনেক কষ্ট বোধ করিতে হয়। একখানা বর্ণপরিচয় যথেষ্ট নয়। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ চাই। ব্যঞ্জনের সঙ্গে যোগ করতে গেলেই স্বরবর্ণের রূপ বদলে যায়। অ-কার অন্তর্হিত হয়, আ-কার এবং ঈ-কার ব্যঞ্জনের পরে বসে, অথচ ই-কার, এ-কার, ঐ-কার আগে বসে। ও-কার এবং ঔ-কারের আধখানা আগে

আধখানা পরে বসে। উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার সাধারণতঃ নীচে বসে, কিন্তু স্থলবিশেষে ব্যঞ্জনের ডাইনে জোড়া হয়। কতকগুলি যুক্ত ব্যঞ্জনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে বদলে গেছে। শিক্ষার্থীকে ২৮টী মূল বর্ণ, ১৩।১৪ রকম স্বর চিহ্ন, য-ফলা, রেফ, র-ফলা প্রভৃতি ৭।৮টী ব্যঞ্জন শিখতে হয়। তা ছাড়া অঙ্ক যতিচিহ্ন প্রভৃতি আছে। ছেলেবেলায় এই সমস্ত আয়ত্ত করতে কি রকম কষ্ট পেতে হয়েছিল তা হয় ত এখন আমাদের মনে নেই।

"ছাপাখানার অক্ষর সমষ্টি আরও বেশী। ইংরেজী ছাপতে ক্যাপিটাল, স্মল, অঙ্ক, যতিচিহ্নাদি সমেত প্রায় ৭০টী টাইপে কাজ চলে, কিন্তু বাংলায় প্রায় ৫০০ টাইপ চাই। এত টাইপ কেন লাগে তা সংক্ষেপে বোঝানো অসম্ভব, সে জন্য তার আলোচনা করব না।"

তিনি (রাজশেখর বাবু) আদর্শ অক্ষরমালার আকৃতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

"আদর্শ অক্ষরমালা কি রকম হবে সে সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী মতভেদ নেই। এমন অক্ষর চাই যা চেনা, পড়া ও লেখা সহজ, যাতে জটিলতা নেই, যার গঠনে রেখার বাহুল্য নেই, যার মোট সংখ্যা অল্প, যার যোজনপদ্ধতি সরল; যাতে শুধু বাংলাভাষার সাধারণ শব্দাবলী নয়, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দও মোটামুটি উচ্চারণ অনুসারে লেখা যায়; ছাপবার জন্য বিস্তর টাইপ দরকার হয় না, যার গড়ন এমন হবে যে ছাপবার সময় সহজে টাইপ ভাঙ্গে না; এবং যা টাইপরাইটারের উপযুক্ত।"

আমার নিবেদন, আমার প্রস্তাবিত সংস্কার সাধনে বাংলা অক্ষরমালা ও উহাদের যোজনপদ্ধতি এমনতরই দাঁড়াইবে।

— ৭ —

সুবিধা বিচার ও আপত্তি খণ্ডন

সংস্কারে সুবিধা

প্রস্তাবিত সংস্কারসাধনে সুবিধা যে কত হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রথমতঃ, **কোমলমতি বালকবালিকার বানান শিক্ষা বিভ্রাটের অনেকটা লাঘব হইবে।** বাবা বা মাষ্টার মশাইকে কোন্ জ, কোন্ ন, কোন্ শ, হ্রস্ব না দীর্ঘ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হয়রাণ হইতে হইবে না। **শিশুদের মস্তিষ্কের উপরও অযথা উৎপীড়ন হইবে না।**

মহিলা অধ্যাপক শামসুন্-নাহার সাহেবা তাঁহার এক অভিভাষণে এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেন ঃ

"শিশুসাহিত্যে বানান সমস্যা দূর করার আশু প্রয়োজন আছে। সব ভাষাতেই বানান স্থায়ীরূপ নিয়ে বাসা বাঁধতে চায়; কিন্তু ভাষারূপ নদীর মত দেশকালের প্রভাবে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়েই চলেছে। শব্দের উচ্চারণ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে অথচ

বর্ণ সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। বাংলা উচ্চারণে উ ও ঊ, ই ও ঈ অথবা শ ষ স-এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অথচ বানানের বেলায় যত চুলচেরা বিচার। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস বর্ণ সংস্কার সম্বন্ধে একটী বইয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রথম লাটিন অভিধান প্রণেতা Varrius Flaccusও মাথা ঘামিয়েছিলেন এ বিষয় নিয়ে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে I ও J, U ও V পৃথক বলে ধরা হত না। ক্রমেই বর্ণ-সংস্কার কিছু কিছু চ'লে এসেছে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক আর্ল বলেছেন:— 'The present rigorous examination in orthography ought to be greatly relaxed if not altogether discontinued as involving a great waste of unprofitable effort.'

"আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন, তবে এ চেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত।

"বানানের কথা বলতে গেলে যুক্তাক্ষর সমস্যা এসে প'ড়ে। বাড়ীর ছোট ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দেখেছি যুক্তাক্ষরের ঠেলা সামলাতে গিয়ে শিশুর পড়ার আনন্দ একেবারে উবে যায়। অথচ শিক্ষার জন্য বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না করে সহজ স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল অব্যাহত রাখা এবং বাড়িয়ে তোলা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির একটা প্রধান কথা। বর্ণপরিচয়ের একেবারে আধুনিক বইতেও কুজ্ঝটিকা, দুর্দৈব, সন্নিধান, কুক্কুট প্রভৃতি এমন সব শব্দ মাথাকুটে শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে যেসব শব্দ নিজের রচনায় জীবনে একবারও ব্যবহার না করলে ক্ষতি নেই—এমন কি তাতে বড় সাহিত্যিক হওয়ারও কোন বাধা হয় না, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

আবার সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করেছি, যখনই 'আটা', 'জাড্য' প্রভৃতি শব্দ ছাড়িয়ে দুই লাইন ছড়া বা পরিচিত কথা এসে পড়ল তখনই ছেলের উৎসাহ বেড়ে গেল দ্বিগুণ—তেমনি তা শেখাও হয়ে গেল চট করে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হয়:

"শিশু-বয়সে নির্জীব শিক্ষার বড় ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নেই। তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহাকে পিষিয়া বাহির করে তার অনেক বেশী। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতি দান করিবেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হোক, সকল দিকেই আমরা মানুষকেই চাই; তাহার পরিবর্ত্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোন কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

আমি 'দ্বিতীয় ভাগে'র ফলা-বিন্যাস শিখিতে যাইয়া শিশুদের দুর্গতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহাতেই তাহাদের সকল কষ্টের শেষ হয় না। বস্তুতঃ শিশু বড় হইতে হইতেও বানান-বিভ্রাটের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকে।

আমি আবার দাবী করিব, আমার প্রস্তাবিত সংস্কার গৃহীত হইয়া গেলে অক্ষর পরিচয়ের পরে আর কোনও বালকবালিকা বানান সম্বন্ধে ধাঁধাঁয় পড়িবে না; এক হইতে এক শত লিখিবার মত 'জল' হইতে 'উজ্জ্বল,' 'নিম্ন' হইতে 'ঊর্দ্ধ'—সকল কথা 'জলের' মতই সহজ হইয়া যাইবে।

বালক-বালিকার হয়রাণি অযথা জাতীয় লোকশান। ভাষা

হইবে জ্ঞানাহরণের বাহন। বাহনই যদি দুর্গম হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান দুর্লভ হইতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, **শুধু বালক-বালিকাই কেন, অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠদেরও দুর্গতি কমিবে।**

সারা ভারতের নিরক্ষর জনগণের সমষ্টি কত বিরাট তাহা সকলেরই জানা আছে। এই যে নিরক্ষর ভ্রাতাভগ্নী, বাবা-মা রহিয়াছেন, ইঁহাদের অবসর সময়ে জ্ঞানাহরণের প্রবৃত্তিও যদি থাকে সুযোগ ততটা কোথায়? Adult Education Programmeএর বিশাল বাধা দেখা দেয় আবার আমাদের ভাষার দুরূহতায়—ব্যাকরণের নিপীড়নে।

প্রস্তাবিত অক্ষর, বানান ও ব্যাকরণ সংস্কারে জনশিক্ষা প্রচারে আরও সুবিধা হইবে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে নিরক্ষরেরা জ্ঞানাহরণে সক্ষম হইবে।

জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয় এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "একখানা বিশাল ব্যাকরণ প্রস্তুত করা সহজ নহে, কর্তব্যও নহে।"

আমার মতে 'বাংলা ব্যাকরণ' নামে যে কয়খানা পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'বিশালত্ব' আরোপ করা চলে কয়েক ক্ষেত্রেই। সংস্কৃত, ল্যাটিন, আরবী ও হিব্রু ব্যাকরণের ছায়া অবলম্বন করিয়া ধারা ও উপধারার ফিরিস্তিকে আরও 'বিশাল' করিয়া ফেলাটা তত কঠিনও নহে। **তবে উহা কর্ত্তব্য যে নহে** তাহাই বলিবার জন্য আমার এত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

তিনি আরও বলেন, "ব্যাকরণ যত ছোট হইবে, ভাষা শিক্ষা

তত সহজ হইবে। ব্যাকরণ একেবারে বাদ দিয়াও যে ভাষা শিক্ষা সম্ভব, তাহা আজকাল বহু মনীষী স্বীকার করেন। ব্যাকরণের জটিলতা বর্তমান যুগের প্রগতির ধারার সহিত সমঞ্জস নহে। তা ছাড়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করিলেও, বহু দিন ধরিয়া (দ্বাদশ বর্ষও লাগিতে পারে) ব্যাকরণ পাঠ করিয়া তাহার সমস্ত নিয়ম ও ব্যতিক্রম আয়ত্ত করিয়া তদ্বারা বাংলা রচনা অভ্যাস অসম্ভব।"

আমারও আগাগোড়া নিবেদনই হইতেছে ইহাই।

তৃতীয়তঃ, **টাইপ বা মুদ্রণকার্য্য সহজ হইবে।** বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কম্পোজ করিতে গিয়া কম্পোজিটারকে যে কত কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তাহার সীমা নাই।

ছাপাখানার পক্ষে সংস্কারের যে কত প্রয়োজন তাহা **'শনিবারের চিঠি'**র সম্পাদক মহাশয় খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন। ২২-২৪ পৃষ্ঠায় আমি তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি।

টাইপরাইটার প্রবর্ত্তন নূতন পদ্ধতিতে এত সহজ হইয়া পড়িবে যে অল্প খরচের ছোট্ট মেশিন বাংলা-আসাম-বিহার-উড়িষ্যা ছাইয়া ফেলিতে পারিবে।

বর্ণবাহুল্য, যুক্তাক্ষর বিভ্রাট, রূপান্তর বিভ্রাট ইত্যাদির দরুণ কম্পোজিটারগণের সময়, শ্রম ব্যয় হয় অশেষ! নূতন ধারায় শুধু কতগুলি গোটা অক্ষর ও হসন্তের প্রয়োজন হইবে।

পঞ্চমতঃ, বানান পদ্ধতি সহজ হইলে লেখক-লেখিকা **বাক্যবিন্যাস বা ভাবপ্রকাশেই বেশী মনোযোগ দিতে পারিবে**

এবং **সাহিত্যসৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া বরং উদ্দীপিত হইবে।**

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুধাংশুকুমার হালদার (আই, সি, এস) লিখিয়াছেন:

"আমার মতে বানান সংস্কার করতেই হবে, এবং তা যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। বানান জিনিষটা হ'ল ভাষার পোষাক,—আর সব রকম পোষাকের মতন সেটা যত সহজ এবং সাদাসিধে হয় ততই ভাল। রাজপোষাকের উষ্ণীষ, কুণ্ডল, বলয়, মণিহার—এ সবের আড়ম্বর মানুষকে পীড়িত করে। সেগুলোকে ঝাড়িয়ে ফেলে সাদাসিধে ধুতি পাঞ্জাবীতে নিয়ে এলে শুধু যে অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় তাই নয়, অনেক সময় এবং পরিশ্রমও বেঁচে যায়! যে যুগে ছিল এ সব আড়ম্বরের প্রয়োজন সে যুগ চলে গেছে। যে যুগ আসছে সামনে, তার সমস্যাগুলি এমন জটিল যে সেখানে বানানের জটিলতা দিয়ে তাকে আরো জট পাকালে চলবে না। ভবিষ্যতের ভাষা যেমন হবে সহজ, সরল, তেজস্বী—তার বাইরের পরিচ্ছদ অর্থাৎ বানানও হওয়া চাই তেমনি। কোনও অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য থাকবে না, কোনও আড়ষ্টপনা থাকবে না।"

ষষ্ঠতঃ, **বিদেশী লোকের বাংলা শিখিবার পরম আগ্রহ থাকিতেও বর্ণিত সমস্যাসমূহের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যে উদ্যম, উৎসাহ ব্যাহত হয় তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি।** ভাষা প্রস্তাবিত মতে সহজ ও সরল হইলে বিদেশীদের আগ্রহ আরও বাড়িবে। বাংলা ভাষা প্রাদেশিক

ভাষা হইতে এমন কি **সর্ব্বভারতীয় ভাষায়** উন্নীত হইবার দাবী করিতে পারিবে।

অসুবিধা ও আপত্তি

অসুবিধাও যে একেবারে হইবে না তাহাও বলিতে পারি না। **অভ্যস্ত প্রণালীর এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন অনেকের মনে পীড়া দিতে পারে।** এ জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত।

আশ্বাসের বিষয় এই যে, কত দিন **দৃষ্টিকটু** বা **পূর্ব্বাচরিত-রীতিবিরুদ্ধ** বোধ হইলেও সকলেই নূতন প্রণালী অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবে। কারণ, **উচ্চারণ ও লিখনে সামঞ্জস্য বিধান করাই এই নূতন প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্য।**

কৃষ্টিসাধনার রাজপথে চলিবার কালে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইহা **জনাকীর্ণ রাজপথ।** এই পথে সবাই অগ্রগামী। মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার কাহারও সাধ্য নাই। যাহারা স্থাণু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহারা পিছনেই পড়িয়া থাকিবে; সহপথিকেরা তাহাদের সম্ভ্রম করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের দিকে তাকাইয়া বসিয়া পড়িবে না।

আমরা পূর্ব্বপথে চলিতে চলিতে যদি কোনও সরল পথের সন্ধান পাই তাহা হইলে নূতন বলিয়াই সে পথকে প্রত্যাখ্যান করিব না। কারণ, যে পথ সুগম, সরল সে পথে চলিলে আমরা গন্তব্যে পৌঁছিব আগে, অল্পায়াসে।

জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয় একটী আপত্তি তুলিয়াছিলেন এই বলিয়া :

"নূতন বানান প্রবর্তিত হইলে পুরাতন লেখকগণের রচনার কি হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাগুলি সংশোধিত করিয়া পুনর্লিখনের অনুমতি পাওয়া যাইবে কি? খ্যাতনামা লেখকগণের সে সকল পুস্তক ছাত্রেরা পড়ে, সেগুলি কি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে?"

আপত্তিটী বাস্তবিকই গুরুতর।

আমার নিবেদন এই যে,

(১) নূতন সংস্করণে ঐরূপ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া কষ্টকর হইলেও অসম্ভব নয় বিশেষতঃ নূতন পদ্ধতি এত সরল, সহজ বলিয়া। আমার পুস্তকগুলি ঐরূপভাবে সংশোধিত করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই পুস্তকের শেষে নমুনা হিসাবে পাশাপাশি পুরাতন ও নূতন পদ্ধতিতে একই কথা দেওয়া হইল। **ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে** নূতন পদ্ধতিতে কোনই কষ্ট হয় নাই।

(২) যে বয়সে ছেলেমেয়েদের পূর্ব্বেকার পুথিপুস্তক ঘাঁটিবার সময় সুযোগ ও আগ্রহ হইবে সে বয়সে পুরাতন বা অধুনাবর্জ্জিত অক্ষরগুলির আকার ও বিন্যাসধারা চিনিয়া লওয়া বা রাখা কষ্টকর হইবে না। কষ্টকর **উহার বিন্যাসধারা মনে রাখা, ব্যবহার করা,—পড়িয়া যাওয়া নহে।**

যুক্তাক্ষর ভাঙ্গাইয়া লিখিলে কাগজের খরচ একটু বেশী হইবে বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। গোটা অক্ষর রাখিলে অন্য সব স্থবিধা এত বেশী যে এই সব সামান্য অস্থবিধা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি। ইংরেজীতে স্বর-ব্যঞ্জন সব ভাঙ্গাইয়া লিখিতে যে কাগজ লাগে, বাংলায় তাহার চেয়ে কম জায়গা এখনও লাগিবে:

Amritabazar Patrika

অম্‌রিতবাজার পত্‌রিকা

Mohammadi

মোহাম্‌মাদি

আমরা চাই—লেখাপড়ার কাজে আরও কোটী কোটী লোক অগ্রসর হউক; আরও কাগজ খরচ হউক। কাগজের মায়া করিয়া ত্বর্বোধ্য অক্ষরবিন্যাসের প্রণালী বাঁচাইয়া রাখিয়া আমরা অসংখ্য লোকের লেখাপড়ার কাজ দুঃসাধ্য করিয়া রাখিতে চাই না।

নূতন পদ্ধতিতে লাভ যে কত বড় হইবে সে সম্বন্ধে আমার দাবী:

অক্ষর পরিচয়ের পরে 'প্রথম ভাগে'ই বানানের কৌশল ছেলেমেয়েরা এত সুন্দর ভাবে বুঝিয়া যাইবে যে আজীবন তাহাদের আর ভুল হইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে না। বানান মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে না; শব্দ বলা মাত্রই উহার একমাত্র বানান চোখের সামনে ভাসিবে।

উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তির পাত্তা পাওয়া যাইবে না বলিয়া যাঁহারা অনুযোগ করিবেন, ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ তাঁহাদের উত্তর দিয়াছেন:

"...আনাড়ী না বুঝিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিতের বুঝিতে গোল ঠেকিবে না। যদি ব্যুৎপত্তির উপরই জোর দিতে হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষা তিব্বৎ ভাষার মত হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিতে হইবে মস্তক, পড়িতে হইবে মাথা; লিখিতে হইবে উপাধ্যায়, পড়িতে হইবে ওঝা; লিখিতে হইবে ঘোটক, পড়িতে হইবে ঘোড়া। এরূপ যদি অসহ্য হয়, তবে ভিক্ষা (ভিক্‌ষা) লিখিয়া কেন ভিক্‌খা পড়া হইবে, জ্ঞান (জ্‌ঞান) কেন 'গেঁন (গ্যান) পড়া হইবে? অন্য পক্ষে যদি পাখী লেখা অশুদ্ধ না হয়, তবে ক্ষেত্র, ক্ষীর স্থানে খেত, খীর কেন অশুদ্ধ হইবে? যদি রাজ্ঞী স্থানে রাণী অশুদ্ধ না হয়, তবে জ্ঞাতি স্থানে বা গেঁতি (গ্যাতি) কেন অশুদ্ধ হইবে?"

এই প্রসঙ্গে আমি বলিব, নূতন পদ্ধতির বানানের জন্য **নূতন অভিধানেরও দরকার হইবে না। পুরাতন অভিধানের ভূমিকায় নূতন সূত্রগুলি উল্লেখ করিয়া দিলেই যে কেহ নূতন বানান এবং পুরাতন পরিচিতি উভয়ই পাইবেন।**

উচ্চারণে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অবকাশ থাকিল না।

থাকিল না ত ভালই হইল। চীন, জাপানের শত শত শব্দাক্ষরমালার মত এ দিকে বাড়াইয়া কোনও লাভ নাই। এত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত জেলায় জেলায় দারুণ উচ্চারণবিকৃতিই দেখা যায়। জনসাধারণের অনেকেই অশিক্ষিত বলিয়া বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। শিক্ষার অগ্রগতিতে উচ্চারণের **সাম্যই** কাম্য; উহা সম্ভবপর হইবে আমার **প্রস্তাবিত উচ্চারণ ও লিখনে সামঞ্জস্য বিধানে।**

উচ্চারণের সাম্যে আবার ফ্যাসাদ আছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, 'সত্য,' 'স্বত্ব,' 'সত্ত্ব,' 'শতত,' বা 'বিকৃত' ও 'বিক্রীত,' 'বিকৃরিত' হইয়া গেলে উপায়? বুঝা যাইবে কি করিয়া? 'স্বত্বের' মোকদ্দমা করিতে আসিয়া অনেকেই 'সত্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন না; ইহা 'সত্ত্বেও' বলিব আমরা জবানবন্দীর পূর্ব্বাপরের কথার গাঁথুনীতে সত্যাসত্য ধরিয়া ফেলি। একই কথার বিবিধ অর্থ যে অভিধানে কত উল্লিখিত আছে তাহা যে কোনও লোক 'কলা' 'বিধি' 'পান' কথাগুলি উল্টাইয়া দেখিলেই পারেন। ইংরেজীতে 'Man' এই সামান্য কথাটার কত অর্থ হয় দেখিলেই হয়। 'খড়ের চাল,' 'বালাম চাল' এবং 'সাহেবী চাল'—এই তিন চালে লিখিবার তফাৎ কোথায়? অথচ বুঝিতে কি কষ্ট হয়?

উচ্চারণ প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। অনেক 'অনুসন্ধান-বিশারদ' শব্দের ব্যুৎপত্তির গোড়া বাহির করিয়াই ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা কথার আসল রূপ অবিকৃত রাখিবার জন্য অযথা হেঁচড়া-হেঁচড়ি করিয়া থাকেন। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ ঠিক রাখা দায়; রাখা হয়ও না। 'কলিকাতা,' 'বর্দ্ধমান,' 'চট্টগ্রাম'কে ইংরাজীতে 'ক্যালকাটা,' 'বার্ডোয়ান,' 'চিটাগং'; 'যেসাস'কে ভাষান্তরে 'যীশু,' 'ইছা,' 'এ্যাব্রাহাম'কে আরবীতে 'ইব্রাহীম,' 'আইজাক'কে 'ইছহাক'; 'পুলিছ'কে 'পুলিশ' করা হইয়াছে। এতটুকু বিকৃতির জন্য মাথা ব্যথা করিয়া লাভ নাই।

উচ্চারণের কথা বলায়, অনেকে আপত্তি উঠাইবেন, তাহা হইলে কি ঢাকা জেলার হালা, জামু, খামু লিখিতে হইবে না কি?

চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়াবাসিরাই বা তাহা হইলে তাঁহাদের উচ্চারিত শব্দ সে মতে লিখিবেন না কেন?

এ কথার উত্তর অতি সহজ। ঢাকা, বাঁকুড়া, চট্টগ্রামবাসিরা যেমন **শুনিয়া শুনিয়া** তাঁহাদের স্ব স্ব কথ্যভাষার প্রয়োগ করেন, তেমনই তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া **দেখিয়া দেখিয়া** অর্থাৎ **লিখিত ভাষা পড়িয়া পড়িয়া** যাহা সাহিত্যে প্রচলিত তাহাই ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে কলিকাতা বা নদীয়াবাসীর ভয়ে তাঁহারা নিরস্ত হন না; সারা বাংলায় যে **লিখিত ভাষা** কালের আবর্ত্তনে দাঁড়াইয়াছে তাহাই অনুসরণ করেন। ঢাকাবাসী কেহ যখন লেখেন তখন শুধু পাড়াপ্রতিবেশী বা জিলার অধিবাসিদের জন্যই লেখেন না; বাংলাভাষাভাষী সবার জন্য লেখেন।

এইজন্যই যদি কেহ শুধু ঢাকার কথ্যভাষায় একখানি বহি লেখেনও, তাঁহাকে তাহা বলিয়া আইনের বলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুমকি দেখাইয়া নিরস্ত করা যাইবে না। তাঁহার পুস্তকও মুদ্রিত ও পঠিত হইতে পারিবে। কেবল সকলের রুচিসম্মত হইবে না বলিয়া উহার প্রসারক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইবে।

দুই একজন পণ্ডিতের একটা ধারণা হইয়াছে এই যে, আমি বুঝি 'উচ্চারণের সামঞ্জস্য' বলিতে 'কথ্যভাষার সহিত সামঞ্জস্য' বুঝাইতেছি, এ কথা ঠিক নহে। 'সাধু' ভাষার বানানপদ্ধতির কথাই আমি আগাগোড়া আলোচনা করিতেছি। তবে 'কথ্যভাষার' বেলায়ও অনেকটা একই কথা খাটিবে মাত্র।

'সাধু' ভাষায়ই শুধু লেখা উচিত বলিয়া ইহারা জোর অভিমত

দিয়া থাকেন। যেহেতু 'করিতেছি' কথাটার মাত্র এক রূপ, অথচ 'করছি,' 'কোর্‌ছি,' 'করচি,' 'কর্চ্ছি' ইত্যাদি বহু পীড়াদায়ক রূপ-বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাই ইঁহাদের মতে লিখিত ভাষায় 'করিতেছি'ই রাখা উচিত।

এর বিপক্ষে বলিলে বলিতে হইবে যে, যখন 'চলিত' ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ সাহিত্যে স্থান পাইয়া বসিয়াছে—শুধু তাহাই নহে, রীতিমত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, তখন আর তাহাকে বর্জ্জন করিবার প্রয়াস কেন?

কথাভাষায় শুধু কলিকাতার ভাষাকেই প্রশ্রয় দিতে হইবে কেন এ কথার উত্তর একটু পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বাস্তবিক পক্ষে শরৎবাবুর সুললিত গদ্যে সাধু ভাষায় বর্ণনার মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা (Dialogue) 'কথা' ভাষায় যেমন সুন্দর লাগিয়াছে, 'সাধু' ভাষায় তেমন লাগিত না বলিয়াই মনে হয়। ইহার কারণ এই যে, পুস্তকে 'কথা বলার' ভাষা প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষার যত কাছাকাছি হইবে, পাঠকের মনে উহা ততটা 'স্বাভাবিক' বা Natural মনে হইবে।

ইহার উপরে আবার বক্তৃতা, নাটক ইত্যাদিতে 'সাধু' ভাষা রাখিলে অনেকটা হাস্যকরই হইয়া উঠে। পূর্ব্বে নাটকে কবিতায় কথাবার্ত্তা চলিত। ইহাতে লেখকেরই বাহাদুরী প্রকাশ পাইত; চাকর, চাকরাণী, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা, এমন কি ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকলেই অনর্গল কবিতা বকিয়া যাইতেছে দেখিয়া শুনিয়া দর্শকের ও শ্রোতার মনে একটা দারুণ 'কৃত্রিম অভিনয়' চলিতেছে বলিয়া মনে হইত। শুধু এখন গদ্যই চলে না; বক্তাবিশেষের

ভাবপ্রকাশের সাধারণ ধারার সঙ্গে যতটা সামঞ্জস্য রাখা যায় ততটাই করা হয়। ইহাতে সুবিধা ও সৌষ্ঠবই রক্ষিত হয়।

যখন নাটক, বক্তৃতা, উপন্যাসের কথাবার্ত্তায় চলিত ভাষা রাখিতেই হইবে তখন আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়ায় আর দোষ কি হইয়াছে?

আমার মতে, 'সাধু' ও 'চলিত' উভয় ভাষায়ই লিখিবার স্বাধীনতা লেখকের থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্করের কথ্য ভাষায় লেখা বস্তুও সাহিত্যে স্থান পাইবে, সমাদৃত হইবে কে না তাহা চাহিবে?

কথ্য ভাষায় উচ্চারিত শব্দেরও 'সহজতম বানান'ই গ্রহণযোগ্য এ কথা আমার 'সাধারণ সূত্রে'র অনুযায়ী।

সংস্কৃত ভাষার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইবার উপক্রম হইবে।

এখানে আমার নিবেদন, সংস্কৃত ভাষার নিকট বাংলা ভাষা খুবই ঋণী। উহার শব্দসম্ভার, বাক্যবিন্যাস এবং ভাবৈশ্বর্য্য ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় '**তৎসম**,' '**ভগ্নতৎসম**' বা '**তদ্ভব**' শব্দ প্রাচুর্য্যের কথা অস্বীকার করিতে যাওয়া নিছক অকৃতজ্ঞতা।

তবে এই সকল শব্দের সহিত যে আবার ফারসী, আরবী, তুর্কী, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজী, ফরাসী হইতে শব্দসম্ভার আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করাও হাস্যকর। ইহা ছাড়া দ্রাবিড়, মুণ্ডা, মোঙ্গোল প্রভৃতির প্রভাবও ইহাতে কম পড়ে নাই।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালাবানান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে এই সঙ্গে বলেন: "...সোজা কথায় বলিতে গেলে আমরা জানিতে চাই,

বাঙ্গালা বানান কি সংস্কৃতের হুবহু নকল হইবে, না উচ্চারণ অনুযায়ী হইবে? যদি বল সংস্কৃত অনুযায়ী হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে সংস্কৃত অনুযায়ী কেন? তুমি হয়ত বলিবে সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার জননী। এখানেই কিন্তু মহা এক খট্‌কা।......বাঙ্গালায় আগে অপভ্রংশ, প্রাকৃত, প্রাচীন প্রাকৃত (পালি যাহার একটী রূপ) ছিল। কাজেই সংস্কৃতকে বাঙ্গালার মা না বলিয়া তাহাকে দিদিমার দিদিমা বলা যাইতে পারিত, যদি পালি ইত্যাদি প্রাচীন প্রাকৃত সংস্কৃতের মেয়ে বলিয়া সাব্যস্ত হইত। কিন্তু পালির কোষ্ঠি বিচার করিয়া অটো ফ্রাঙ্কে প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃত পালির মা নয়। পিশেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন, খালি তাহাই নয়, সংস্কৃত প্রাকৃতেরও মা নয়। তবু তর্কের খাতিরে, যদি মানা যায় বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতেই বাহির হইয়াছে, তাহা হইলে বাঙ্গালার বানান যে সংস্কৃতের মতন হইবে তাহার হদিস কি? পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ কোনটাই ত সংস্কৃতের বানান মানে না। বাঙ্গালা মানিতে যাইবে কেন? পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ লিখে, দক্‌খিণ, আমরা কেন লিখিব দক্ষিণ? পালি লিখে ঞাতি, ঞাণ, প্রাকৃত লিখে ণাই, ণাণ; আমরা কেন লিখিব জ্ঞাতি, জ্ঞান? মাগধী প্রাকৃত লিখে 'শে,' আমরা কেন লিখিব 'সে'? পালি লিখে জিব্‌হা, প্রাকৃত লিখে জিব্‌ভা, আমরা কেন লিখিব জিহ্বা? যদি সাবেক নজির মানিতে হয়, তবে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের শাসনে আনা চলে না।"

সংস্কৃতের মতন বানান রক্ষা করিবার সকল ক্ষেত্রে আগ্রহও দেখা যায় না। 'যখন,' 'তখন,' 'শোনা,' 'চুল,' 'শোওয়া,'

'বসা'য়,—'যৎক্ষণ,' 'তৎক্ষণ,' 'শৃণোতি,' 'চূড়া,' 'স্বপ,' 'উপবিশ'এর সঙ্গতি রক্ষা করা হয় না।

অধিকন্তু বাংলা ভাষা **আধুনিক**। উহা বঙ্গ-আসাম, বিহার-উড়িষ্যার কোটী কোটী নরনারীর ভাবপ্রকাশের ও পঠন লিখনের **বর্ত্তমান** বাহন। ইহারা আধুনিক; ইহারা ক্রমোন্নতিশীল জগতের প্রগতিশীল সন্তান। ইহারা কি **বিচার-বিবেচনা** করিয়া **দোষ-ত্রুটি বর্জ্জন** এবং **সুনিয়ম** অর্জ্জন করিবে না?

বর্জ্জন অর্জ্জনের কথাই আমাকে বাংলা ভাষায় **সাম্প্রদায়িক মনোভাবের** কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামী। বর্জ্জন এবং অর্জ্জন দ্বারাই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে।

পুরাকালে প্রচলিত ভাষায় আধুনিক জ্ঞানোন্নত জগতের অনেক শব্দই না থাকিবারই কথা। এই সকল শব্দ ভাষাকে **গঠন** বা **অর্জ্জন** করিতেই হইবে। **কোন ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে।** পারিপার্শ্বিক ভাষাসমূহের ছাপ বা প্রভাব উহাতে পড়িবেই; পড়াই উচিত। না পড়িলে বুঝিব, ঐ ভাষা নূতনকে ও সুন্দরকে প্রত্যাখ্যান করিল। উহা স্থাণু; প্রগতিশীল নহে।

এই হেতু বাংলা ভাষাকেও ইংরেজী, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষা হইতে **গ্রহণ** করিতে হইবে। প্রায় সবগুলি বিরামচিহ্নই আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ গ্রহণের বিরুদ্ধতা করা যেমন **নির্ব্বুদ্ধিতা**; জোর করিয়া **চালানও** তেমনি ঔদ্ধত্য।

বর্জ্জন, অর্জ্জন, আদান, প্রদান এই সবগুলিই প্রগতির লক্ষণ।

নজরুল ইসলাম প্রমুখ লেখকদের শব্দ আহরণ ও সুবিন্যাসকৃতিত্ব, সমৃদ্ধি ও গৌরবেরই কথা হইয়াছে।

ইংরেজী ভাষায় যে কত বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দসম্ভার গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া William H. Nicolas* বলেন,—The thug loafed at a damask-covered table on the café balcony Wednesday eating goulash and drinking chocolate with a half-caste brunette in a kimono-sleeved lemon frock and a crimson angora wool shawl, while he deciphered a code notation from a canny smuggler of tea cargoes on the back of the paper menu—এই বাক্যে ২১টী বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ আসিয়া জুড়িয়াছে! Thug—হিন্দুস্তানি; Cafe, brunette, deciphered, menu—ফ্রেঞ্চ; balcony—ইতালিয়ান; damask—হিব্রু; Covered, table, code, notation—ল্যাটীন; Wednesday, ugly, drinking, half, while, eating, wool, sleeved, back—এ্যাংলো স্যাক্সন; loafed—ভেনিস; crimson—সংস্কৃত (?) (স্পেনিস); goulash—হাঙ্গারীয়; chocolate—মেক্সিকান; caste—পর্ত্তুগীজ; lemon—আরবী; shawl—ফারসী; kimono—জাপানী; angora—তুর্কী; canny—স্কটীশ; tea—চৈনিক; cargo—স্পেনীশ; smuggler—ডাচ; paper—গ্রীক; frock—পুরাতন জার্ম্মান!

* The National Geographic Magazine—Washington—December, 1944 issue.

অনেকে হয়ত বলিবেন, এটা কষ্টবিন্যস্ত বাক্য। কিন্তু যে কোনও একটী বাক্য ধরিয়া বিন্যাস করিলেই মোটামুটি এইরূপ দেখা যাইবে :

On getting to his apartment he takes up his pen; and the cloud begins to descend in a hail-storm.

on—পুরাতন ইংরেজী : গ্রীক an ;

get—পুরাতন নর্স হইতে পুরাতন ইংরেজী gietan—আর্য্য ভাষার ghed হইতে ;

to—পুরাতন ইংরেজী ;

his—পুরাতন ইংরেজী ;

apartment—ফরাসী ভাষার appartement হইতে ;

take—পুরাতন ইংরেজী tacau, পুরাতন নর্স ভাষার taka হইতে ;

the—পুরাতন ইংরেজী the, তৎপূর্ব্বের se হইতে ; the= ডাচ de ; জার্ম্মান der, die, das ; ল্যাটিন iste, -ta, -tud , গ্রীক ho, he, to : সংস্কৃত তৎ ;

up—পুরাতন ইংরেজী ;

pen—পুরাতন ফরাসী ভাষার penne হইতে ; উহা আবার ল্যাটিনের penna = feather হইতে ;

and—পুরাতন টিউটোনিক anda , andi হইতে ;

cloud—পুরাতন ইংরেজী clid ;

begin—পশ্চিম জার্ম্মান ; আর্য্যভাষার ghi = open ;

de-scend—ফরাসী ভাষার descendre ; উহা আবার ল্যাটিন de-scendre হইতে,

in— টিউটোনিক,

a—পুরাতন ইংরেজীর a´n হইতে সংক্ষিপ্ত ,

hail—টিউটোনিক—পুরাতন ইংরেজী hagol

storm—পুরাতন ইংরেজী ডাচ, সুইডিস ও ডেনিস ভাষায়ও তদ্রূপ ; জার্ম্মান sturm ;

ইংরেজী অভিধানের যে কোনও পৃষ্ঠার শব্দগুলি পর্য্যবেক্ষণ করুন। এই ধরুন আমি উদাসভাবে পাতা উল্টাইয়া Concise Oxford Dictionary-র ২৬৮ পৃষ্ঠা খুলিলাম। তামাসা দেখুন!

Creed—ল্যাটিন Credo হইতে,

Creek—অনির্দ্দিষ্ট , বোধ হয় গ্রীক হইতে,

Creel—উৎপত্তি অজ্ঞাত,

Creep—টিউটোনিক,

Crease— মালয়,

Cremate—ল্যাটিন Cremare হইতে,

Creme—ফরাসী,

Crenate- ইতালীয় Crena হইতে,

Creole—ফরাসী Cre´ole হইতে, উহা আবার স্পেনীশ Criollo হইতে,

Creosote—গ্রীক Kreas=meat+Sozo=Save,

Crepe—ফরাসী, উহা আবার ল্যাটীন হইতে,

Crepitate—ল্যাটিন Crepitare হইতে,

Crepuscular—ল্যাটিন Crepusculum,

Crescendo—ইতালীয়,

Crescent—ইতালীয়,

Cress—পুরাতন ইংরাজী, পুরাতন High German হইতে,

Cresset—পুরাতন ফরাসী,

Crest—পুরাতন ফরাসী,

Cretaceous—ল্যাটিন হইতে,

ইংরাজীতে চীন, জাপান, বার্ম্মা, মালয়, ভারতবর্ষের নানা ভাষা হইতেও নানা শব্দ গিয়া জুটিয়াছে।

Monsoon—বোধ হয় আরবী মৌছম পর্ত্তুগীজ moncao ডাচ monssoen হইতে,

Chink—চীনদেশীয়,

Rickshaw—জাপানী,

Chukker, punkha, pukka, takid, mamuli, gymkhana, shikar, shikaree, bungalow, godown, almira, veranda, loot, dacoit—ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ ভারতীয় ভাষাসমূহ হইতে ইংরেজীতে সরাসরি ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এতদূর বলার প্রয়োজন হইল এই জন্য যে, কথায় কথায় 'বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল' বলিয়া চীৎকার করিবার লোক এদেশে বেশী। ইহার উদ্দেশ্যই ভাষায় 'জগা-খিচুড়ী'র ভয় দেখাইয়া 'বিজাতী বর্জ্জনে'র অভিযান চালাইবার অপ-প্রচেষ্টা। 'ছুঁৎমার্গ' এদেশে যথেষ্ট রহিয়াছে! আর নয়!

এই 'খিচুড়ী' যে বাংলাভাষায়ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা দেখাইতে গিয়া জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয় ব্যঙ্গচ্ছলে হইলেও সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ীর দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোষাক পরি তাহা বাঙ্গালী, পারশী, পাঞ্জাবী, ভারতীয় ও অভারতীয় পোষাকের খিচুড়ী। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল, চচ্চড়ী ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ কাটলেট ও কোর্মা কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না। আমাদের আহারের তালিকা দেশীয় ও বৈদেশিক রীতির সংমিশ্রণে ক্রমশঃ কিরূপ খিচুড়ী পাকাইতেছে তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক এবং এই সংমিশ্রণে যে শুধু অপকারই হইতেছে তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। অপকারই হউক আর উপকারই হউক, সংমিশ্রণ যে অনিবার্য তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

"পরিবারের মধ্যে বিধবা মাসিমা নিরামিষাশিনী এবং উপবাস পূজা-পার্বনাদিরতা; বৃদ্ধ জেঠামহাশয় আফিমের নেশায় ভরপূর; ছোট মামা ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজেন: পিসেমশাই ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ; খুকী পেঁয়াজের গন্ধে বমি করে; খোকা পেঁয়াজের ফুলুরি পাইলে ডবল ভাত খায়; কর্তা মুরগী ভালবাসেন; গৃহিণী মুরগী স্পর্শ করেন না, ইত্যাদি **নানা প্রকার রুচির এবং অভ্যাসের খিচুড়ী** এক বাড়ীতে দেখিতে পাই। ইহা অনিবার্য।

"মানুষের ভিতরে-বাহিরে, আশে-পাশে, সর্বত্রই যখন খিচুড়ীরই রাজত্ব, তখন শুধু তাহার ভাষা সম্বন্ধে একটা অনির্দেশ্য পবিত্রতার প্রতি এত মোহ কেন? মানুষের **ভাষা খিচুড়ী হইতে বাধ্য—অতীতে হইয়াছে, বর্তমানে হইতেছে** এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।..."

আমি অহেতুক সঙ্কোচ বা প্রতিক্রিয়াশীলতার পরম বিরোধী।

পৃথিবীর কত সাধনা, মানবমনের কত প্রেরণা, কত উচ্ছ্বাসের ভাব লইয়া ভাষা অধীর গতিতে প্রবাহিত হয়! ভাষাকে বাড়িতে হইলে তাহার আলো-হাওয়ার দরকার। সে আলো যেমন করিয়াই আসুক, সে হাওয়া যেখান হইতেই বহিয়া আসুক আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আমরা তাহা করিব সাদরে।

বাংলা বাংলাই থাকুক; তবে বাহিরের আলো-বাতাসের সংস্পর্শে প্রাণবন্ত জাতি ও প্রগতিশীল ভাষাসমূহের ভাবধারায় সমৃদ্ধ হউক বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধিকামী কে না তাহা না চাহিবে?

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার **"জাতীয় সাহিত্যে"** বলেন,—"অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি ভরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই।"

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, **রাজনৈতিক** বা **সামাজিক বিচার-বিবেচনা** যেন আমাদের **সাহিত্য** বা **কৃষ্টি সাধনাকে সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ** বা **ব্যাহত** করিতে না পারে।

— ৮ —

ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা না বলিলে আমার সংস্কার প্রস্তাব সম্পৃকিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কারণ, অনেকের মনে হইতে পারে, ভাষাকে যেমন উলট-পালট করিবার প্রস্তাব আমি করিয়াছি তাহাতে বুঝি বা সাহিত্যের কিছুই থাকিবে না। অর্থাৎ বুঝি আমার প্রস্তাবগুলি নিতান্তই ধ্বংসমূলক (Destructive)।

আমার নিবেদন, আমার সংস্কার-প্রস্তাবে সাহিত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত দূরে থাকুক এমন কি এতটুকু বাধাপ্রাপ্তও হইবে না। বরং পক্ষান্তরে সাহিত্য আরও পরিপুষ্ট হইবে। কি করিয়া তাহাই এখানে আলোচ্য।

ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তাহা ভালমতে বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়েই আমি ভাষার উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহা বলিয়াছি।

ভাষা দ্বারা আমরা সাধারণতঃ উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মানুষের মনোভাব প্রকাশের ব্যবস্থা বুঝিয়া থাকি।

লিখিত ভাষা ঐ সকল ধ্বনিরই সাঙ্কেতিক প্রতিধ্বনি মাত্র।

ধ্বনিমূলক ভাববিনিময়ই বেশী সুবিধাজনক বলিয়া মানুষের সকল শ্রেণীর মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায়। সকল ক্ষেত্রেই কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে বক্তা ও শ্রোতা কতগুলি বিশেষ অর্থ বুঝে।

বহু দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ মানুষের অভিব্যক্তির পরে লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজনের খাতিরে সাময়িক ভাবে লোকে কথা বলিয়াছে ও বুঝিয়াছে। কিন্তু কথা ত আর ধরিয়া বা বাঁধিয়া রাখা যায় না! প্রেমনিবেদনই হউক, ক্রোধ-জ্ঞাপনই হউক, বক্তৃতাপ্রদানই হউক—মুশকিল এই যে, বক্তার কথা অল্প পরিসরে কার্য্যকরী হয় এবং নিমিষেই হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। অবশ্য রেডিওযোগে দূর দূরান্তে প্রচার করা বা ফনোগ্রাফে কথা ধরিয়া রাখা আধুনিক যন্ত্রকৌশলেই সম্ভবপর হইয়াছে।

উচ্চারিত কথার এই ক্ষণিকে বিলীয়মানতা মানবমনকে পীড়িত করিয়াছে। মানুষ অমর নয়; তাহার জীবনও অল্প পরিসর—অথচ তাহার নিদর্শন রাখিয়া যাইবার পিপাসা খুব তীব্র। মানুষের মন যেন গাহিয়া গাহিয়া বলিতে চায়,

'যখন রব না আমি দিন হ'লে অবসান,
আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান।'

আজ যাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিলাম, আজ যাহাকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিলাম, কালই সে দূরে চলিয়া গেলে আর

তাহাকে কিছুই জ্ঞাপন করিতে পারিব না, আজ একজন যাহা অঙ্গীকার করিল কালই অস্বীকার করিলে সব ফুরাইয়া গেল, এ অবস্থার কোনও প্রতিকার হইবে না; আজ যে প্রাণ ভরিয়া সুখ বা নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিলাম কিছু দিন পরে বা অন্য কাহারও জ্ঞাতার্থে এ অবস্থার বিবরণ রাখিতে পারিব না ;—এতাদৃশ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াই মানুষ লিখিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে।

মানুষের জীবনে কার্য্যকরী বিবিধ আবিষ্কারের মধ্যে সব চেয়ে কোনটী বৃহত্তম ইহা লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছে এবং হইতেছে। বোধ হয়, কোন চীনাবাসী যদি মাটী খুঁড়িবার কাষ্ঠফলক বাহির না করিত, কেহ যদি চাকা না বানাইত, কেহ যদি আগুন আবিষ্কার না করিত তাহা হইলে মানব সভ্যতা কতদূর পিছনে পড়িয়া থাকিত তাহা ভাবিবার বিষয়—কিন্তু লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত না হইলে যে মানবগোষ্ঠীর কি দশা হইত তাহা বলা দায়। এ্যাব্রাহাম লিঙ্কলন এ বিষয়ে অভিমত করিয়াছেন যে, সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে উড়া কথা ধরিয়া রাখার প্রণালীই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। লিখন প্রণালী না হইলে অতীতের ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হইত; প্রাচীন ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন হইত। বেদপুরাণ, বাইবেল, কোরান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রমাণ—কিছুরই অস্তিত্ব থাকিত না।

দূরে অবস্থিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে অবহিত করিবার, পরবর্ত্তী কালে পঠিতব্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার, ভবিষ্যতের মানবসন্তানের কাছে নিবেদন, প্রমাণ বা উপদেশ রাখিয়া

যাইবার আগ্রহ মানবমনকে নানা বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। অবশেষে সে জয়যুক্ত হইয়াছে—লিখন পঠনের কৌশল আয়ত্ত করিয়া কিন্তু কত ঘাত প্রতিঘাত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া! .

অমর মনীষী রবীন্দ্রনাথ কয়েকটী সংক্ষিপ্ত কথায় এই প্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন ঃ

—"মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহুমনকে আয়ত্ত করা।

"এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি—কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই,—কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে. খোন্তায়, কলমে, আঁকজোঁক, কত প্রয়াস বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কি?—না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে, চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে! আমার বাড়িঘর, আসবাবপত্র, আমার শরীরমন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।"

লিখার প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পরে উহার সহায়তায় লোকে প্রয়োজন মিটাইয়াছে। চিঠি, পত্র, দলিল, দস্তাবিজ, বিবরণী হইতে ক্রমে ক্রমে ইতিবৃত্ত, উপদেশ, আইন, কানুন, ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছে।

সাহিত্য

সাধারণতঃ ভাষার লিখিত প্রকাশকেই সাহিত্য বলা হইয়া থাকে।

মৌখিক ভাষা পুরাতন, সর্ব্বব্যাপী; **লৈখিক ভাষা** অনুবর্ত্তী, সীমাবদ্ধ।

মৌখিক ভাষা সাধারণতঃ স্থায়ীরূপ পায় না; সাহিত্য ভাষার স্থায়ীসম্পদ।

মৌখিক ভাষা অল্প পরিসরে ব্যক্তি বা গণ্ডীবদ্ধ সমষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত; লৈখিক ভাষা স্থায়ীরূপ পাওয়ায় বহুল প্রচারিত এবং দেশকালের গণ্ডীবহির্ভূত।

সাহিত্য বলিতে আবার অনেকে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বুঝেন না। এই সকল বস্তুতান্ত্রিক; গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ততটা ইহাতে হয় না। দশজনে লিখিলেও লিখিত বস্তু প্রায় এক রকমই দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের **সৃষ্টি**। প্রত্যেক স্রষ্টার নিজস্ব ভঙ্গী উহাতে প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির চেহারা যেমন বিভিন্ন, উহার মনোভাব যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই উহার ভাবপ্রকাশ বিশিষ্ট হইতে বাধ্য।

অন্তর্জগতে চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণার অপরূপ বিচিত্রতায়ই মানসলোকের অসীম রহস্যময়তা; কাহারও অন্তঃপ্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ, কাহারও উগ্র, বিক্ষুব্ধ, কাহারও নমনীয়, কাহারও সুদৃঢ়। প্রকাশ-ভঙ্গীও তাই বিচিত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

তাই তত্ত্বমূলকের চেয়ে ভাব বা রসমূলক লেখাকেই আমরা 'সাহিত্য' বলিতে বেশী বুঝি।

সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজের নানা যুগ, সমাজের অতীত ও বর্ত্তমানকে সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিতে পারে বলিয়াই সাহিত্যদর্পণে মানুষ নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। হৃদয়ের ঘাত, প্রতিঘাত, জীবনের অকথিত বাণী সকলই যেন গ্রথিত হইয়া থাকে সাহিত্যের ভাষাময় প্রকাশে।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যার রূপক কথায় হইলেও 'সাহিত্যে'র সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন :

"সাহিত্য বলিতে বুঝি, যাহা জাতির অন্তর হইতে সমুদ্ভূত এবং তাহার প্রাণরসে পরিপুষ্ট হইয়া, সেই জাতির রস-ঘন সত্যমূর্ত্তিটিকে জগৎসমক্ষে ধরিয়া দেয়। সাহিত্য কাহারও ফটোগ্রাফ নয়, চিত্র : ইতিহাস নহে, সঙ্গীত ; ডাইরি বা জমাখরচের খাতা নহে—একটু আনন্দ, একটু সৌন্দর্য্য, একটু মধু। এই জন্য সাহিত্য কোনও একটা বিশেষ কালের নয়—সে নিত্য, চিরন্তন, শাশ্বত ; কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষেরও নয়—সে সার্ব্বজনীন ; কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়েরও নহে, সে সব বিষয়ের মধ্যে বিষয়াতীত ; এই জন্য সর্ব্বব্যাপী এবং বিরাট! সাহিত্যে কল্পনার রং আছে, কিন্তু সে-রংএর পরপারে পাওয়া যায় অদ্বৈত সত্যকে ; সাহিত্যে অলকার ঐশ্বর্য্য ও শ্মশানের চিতাভস্ম মিশিয়া সে হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয়ী শিব।"

সাহিত্য পারিপার্শ্বিক বস্তু, ঘটনা বা অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা নহে ; অর্থাৎ ক্যামেরায় তোলা ফটোগ্রাফী নহে। উহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্মৃতিরসাশ্রিত শান্ত-সমাহিত অবস্থার স্বতঃ

উৎসারিত বাণী। সাহিত্যিক নিজের দৃষ্টিতে দেখেন, নিজের কল্পনারসে পরিপুষ্ট করেন এবং পরিচিতকে অভিনব ও অকিঞ্চিৎকরকে অসাধারণ করিয়া দেখান।

দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরেই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়; ব্যক্তিত্বই আবার পাঠক-পাঠিকার মনের উপরে প্রভাববিস্তার করে বা ছাপ রাখিয়া যায়।

সাহিত্য তাই বহু ব্যক্তিত্বের প্রভাবক্ষেত্র। আমরা যেমন সকলেই কথা বলি কিন্তু কেবল কয়েকজন লিখি, তেমন অনেকেই লিখি কিন্তু কেবল কয়েকজনের লেখা উচ্চ ধরণের বলিয়া সাহিত্য শেষোক্তরূপ লেখা লইয়া গঠিত হয়।

অবশ্য পয়সার জোরে যাহা তাহা লিখিয়া ছাপাইয়া দিতে বাধা নাই কিন্তু মানবসমাজ উহাকে গ্রহণ করিয়া সাহিত্যের আসন দিতে চাহিবে না।

লিখিত কথা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক হইতে বাধ্য। মানুষের মনোরাজ্যে অধিকার স্থাপন করিবার যাহার শক্তি আছে তাহা লইয়াই সত্যকার সাহিত্য গঠিত হয়।

একটী বিশিষ্ট ঘটনা নানা লো2কর উপরে নানাভাবে আঘাত করিবে; ঐ একই ঘটনার বিবৃত্তি নানা লোকে নানা ভাবে দিবে। তাই প্রত্যেক বক্তা বা লেখক তাহারা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ কথা বা লেখার উপরে রাখিবেই।

তাই ভাষার আকার যাহাই হউক, ভাবের ধারা চিত্তকে জয়, মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। সংস্কৃতের বেদ পুরাণ, আরবীর কবিতা,

কোরান, হিব্রুর বাইবেল মানুষের মনের রাজ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাইয়া বসিয়া আছে।

তবে আধুনিক যুগে সর্ব্বলোকের উপযোগী ভাষার উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতার মাপকাঠি হইয়া পড়িয়াছে অন্য রকম। কোনও ভাষাকে উৎকৃষ্ট বলিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে:

(১) উহা সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী কি না?

(২) উহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য এবং সহজলিখ্য কি না?

(৩) আধুনিক মুদ্রণ, টাইপরাইটার, শর্টহ্যাণ্ড যন্ত্রকৌশলে সহজে ব্যবহার্য্য কি না?

সকল ভাষারই উৎপত্তি হইয়াছে ছাপাখানা, তার, বেতারের বহু পূর্ব্বে। তবে এখন যে তৈয়ারী কোনও ভাষা চালাইয়া দেওয়া যায় না তাহা নহে। Esperanto, Volapuk প্রভৃতি প্রচলনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টার মূলেই রহিয়াছে পুরাতন ভাষা-সমূহের আধুনিক কালোপযোগী বহু অভাবের অনুভূতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়িয়া বাংলা ভাষা সাধারণবোধ্য ও সর্ব্ব-লোকের উপভোগ্য হইল; রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার কথ্যভাষা চালাইয়া দিয়া উহাকে সাহিত্যিক রূপ ও মর্য্যাদা দিয়া গেলেন;— তাই বাহনের রূপ পরিবর্ত্তিত হইলেই যে উঁচু মন ভাবপ্রকাশে সংযত বা বাধাপ্রাপ্ত হইবেন এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আমার প্রস্তাবিত সংস্কারে লেখার চেহারা বদলাইলেও শব্দবিন্যাসের ধারা বদলাইবে না। বানান-ব্যাকরণের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইয়া

ভাবুক ভাবপ্রকাশে অধিকতর সক্ষম হইবে; সাহিত্য বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া আরও উদ্দীপিত হইবে।

অনেকে হয়ত মনে করেন আমরা ব্যাকরণ শিখিয়া ফেলি বলিয়া ব্যাকরণে যাহা অসিদ্ধ তাহা লিখি না। এ কথা ঠিক নয়।

লিখিবার বেলায়ও আমরা অনুকরণবৃত্তি দ্বারা চালিত হই। অর্থাৎ অপরে যেমন ভাবে লেখে আমরাও তাহাই করিতে থাকি। এই জন্যই চট্টগ্রামের নবীন চন্দ্র, বরিশালের অশ্বিনীকুমার, যশোহরের মধুসূদন, কলিকাতার রবীন্দ্রনাথ কাগজের পৃষ্ঠায় আঁচড় মারিবার বেলায় প্রায় এক হইয়া যান। আমি 'প্রায়' বলিয়াছি; ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র কথা।

ইঁহারা সকলে এক ব্যাকরণ পড়িয়াছেন তাহা নহে। ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের অনুগামী। যাঁহারা ইঁহাদের অনুবর্ত্তী তাঁহারাও মোটামুটি একই রকম লিখিবেন।

এখানে কলিকাতা বা নদীয়ার কৃতিত্বের কোনও কথা উঠে না। লিখিত ভাষা আস্তে আস্তে কাঁহারও বা কাঁহাদেরও হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল; অনুবর্ত্তীরা ঐ ধারা রাখিয়া আরও অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র।

ব্যাকরণের উৎপত্তি সাহিত্যধারার অতি নিম্নে। সকল ভাষায়ই তাই।

প্রায় সকলেই গান গায়; অথচ যত্ন করিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে যেমন আমরা উৎকৃষ্ট গানগুলি উঠাইয়া রাখি, তেমনই অনেকেই লিখিয়াছেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল ভাল লেখাগুলিই সাহিত্যের আকারে আমরা পাইয়াছি।

এই ভাল লেখা সকল ক্ষেত্রে ব্যাকরণসম্মত কি না তাহা আমরা দেখি না ; ব্যাকরণকারদের মতামতও আমরা জিজ্ঞাসা করি না। আমাদের যাহা ভাল লাগে, প্রাণে আনন্দ বা মনে জ্ঞানের সঞ্চার করে তাহাকেই আমরা আদর করি ; তাহারই মত নিজেদের লেখাও ঢালাই করি।

আমার দুইখানা পাখা গজাইল—উড়িয়া বাড়ী গিয়া দেখি আমার স্ত্রী লোহার গোল্লা গিলিতেছেন,—এইরূপ বর্ণনা ব্যাকরণ-সম্মত হইলেও উহার অর্থ হয় না।

পক্ষান্তরে 'আমার ছাইলা ঘরের কোণে শুইয়া আছে'—ইহার অর্থ হইলেও লিখিতে আমাদের কলম আটকাইয়া আসিবে।

মোটের উপর, ভাব ও ভাষা উভয়ের সঙ্গতি কাম্য। **ভাবের উৎকর্ষ হইবে উচ্চতর মনের সংস্পর্শে**; ভাষার পারিপাট্য আসিবে **সুসাহিত্যের ধারা হইতে।**

এই প্রসঙ্গই এখন আমাদের আলোচ্য।

— ৯ —

সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনাপারিপাট্য (Style)

আমি সাহিত্যকে সৃষ্টি বলিয়াছি। ভাষার যে বিশিষ্টরূপ সাহিত্য বলিয়া পরিচিত তাহা সাধারণ ভাষা হইতে পরিমার্জ্জিত।

সকল দেশেই কথ্য ভাষা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইংরেজী ভাষা ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ডে নানা ভাবে, নানা স্বরে বলা হয়। বাংলাও চট্টগ্রাম হইতে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত জেলায় জেলায় রূপ বদলায় ; বিভিন্ন ভঙ্গী রেকর্ডে শুনিলে হাসি পায়।

জ্যোতির্ময়বাবুর কথায়, যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র জানা এবং প্রয়োগের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও 'উয়ারীর পথে জ্যুতিষ বাবুর কুটের বুতাম খুলিয়া পড়ে' ; আবার 'রোব্বারে দোবো বলে কারু ঠেঙ্গে চাল্লিশটে টাকা নিয়ে তা দিয়ে আব কিনে খেয়ে বেস্পাতিবারেও শোধ না দেওয়া' আমাদের অনেকেরই অভ্যাস।

বাস্তবিক পক্ষে 'পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাব'ই আমাদিগকে কথ্য ভাষা শিক্ষা দেয়। আমরা অনুকরণপ্রিয়, তাই যাহা 'শুনি' তাহাই 'বলিতে শিখি'।

কিন্তু লিখিবার বেলায় অমন হয় না কেন? আমরা যাহা বলি তাহা লিখি না কেন? তাহার একমাত্র কারণ—**আমরা যাহা পড়ি তাহাই লিখি।**

ব্যাকরণকে আমি উড়াইয়া দিতেছি এ কথা যাঁহারা বলিবেন তাঁহাদিগকে বলিব, মোটেই নয়। ব্যাকরণকে আমরা রাখিব সুশৃঙ্খল কয়েকটী সূত্রের সমষ্টির আকারে। চুলচেরা ভাগাভাগি করিব না; অনাবশ্যক সূত্রের বাড়াবাড়ি ও ব্যতিক্রমের ছড়াছড়ি থাকিবে না। কতগুলি ব্যাপক বিধি—যাহা অনায়াসে বোঝা যায়, মনে রাখা যায়, পালন করা যায় তাহা লইয়াই হইবে আমাদের ব্যাকরণ। ব্যাকরণের উপরেও স্থান পাইবে 'সাধুপ্রয়োগ' এবং 'যুক্তিসঙ্গত নূতন ধারা'। **পুরাতন আমাদিগকে টানিয়া ধরিবে; নূতন টানিয়া লইয়া চলিবে।**

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া যাঁহারা আমার প্রচেষ্টাকে নিন্দা করিবেন তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন—আমার আশা বাংলা ব্যাকরণকে সচ্ছল, মুক্ত রাখিবার।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্-এ পি-এইচ-ডি, মহাশয় তাঁহার 'বাংলা বানান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন:

"......বর্তমান সময়ের বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই স্বল্প-পরিবর্তিত সংস্করণ মাত্র। এ অবস্থাটা সন্তোষজনক নহে। ভাল ইংরাজী শিখিতে ল্যাটিন, গ্রীক বা হিব্রু শিক্ষার যেমন আবশ্যকতা নাই তেমনি ভাল বাংলা শিখিতে সংস্কৃত শিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা বাঞ্ছনীয় নহে। ইংরাজী শব্দের মুল ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি না জানিয়াও শুধু অভিধান সাহায্যেই শব্দশিক্ষা হইতে পারে।

সেইরূপ সংস্কৃত ভাষা বা ব্যাকরণ না জানিয়াও অভিধান সাহায্যে বাংলাভাষার ব্যুৎপত্তিলাভ যাহাতে সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইবে। 'ধনী' শব্দের ব্যুৎপত্তি না জানিয়াও, ইহার বানান ও অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব মনে করা কর্তব্য নহে।" *

আমার প্রস্তাবিত বাংলা ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি বুঝিতে বা মনে রাখিতে কষ্ট হওয়ার কথা নহে। আমি শুধু গোড়াপত্তন করিয়াছি; সহযাত্রীরা আমার ভাবধারাকে সুশৃঙ্খল করিয়া সুষ্ঠু বাংলা ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিলে আমি কৃতজ্ঞই হইব। তবে একটা কথা মনে না রাখিলেই চলিবে না—আবার যেন বাড়াইতে বাড়াইতে কেহ সপ্তকাণ্ড যোজনা না করিয়া বসেন !

ব্যাকরণ সাধারণ রচনা কৌশল আয়ত্ত করিতে সহায়তা করে মাত্র। রচনার সৌষ্ঠব, উহার পারিপাট্য, ষ্টাইলের সূক্ষ্মধারা লেখকের ব্যক্তিত্বের সহিত বিজড়িত থাকায় অনেকটা রহস্যময় বলিয়াই মনে

* এ সম্পর্কে Reader's Digest পত্রিকায় একজন লেখক মন্তব্য করেন :

All children master the fundamentals of a language by the time they are five, which suggests there is nothing very abstruse about language-learning. They all learn to speak before they begin to read. In traditional language courses, about three-fourths of the student's time is spent in learning rules of grammer and applying them by conscious logic. This leaves far too little time for practice. **The habit of searching in the files of one's mind for rules kills both interest and native linguistic ability. In learning a language everlasting practice and repetition are the most important factors."**

হয়। ষ্টাইলের নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে সকলের সম্মুখে ধরিতে বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে লেখক নিজেই অপারগ। আবার সৃষ্টি করিবার দিকেই যাঁহার ঝোঁক—সৃষ্টি করাই যাঁহার ধর্ম্ম, কলকাঠি, যন্ত্র-তন্ত্র গোপন করিয়া যাদুকরের মত দর্শক-মণ্ডলীকে সৃষ্ট সামগ্রী দিয়া স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার আনন্দ। চিন্তাভাবনা, দ্বিধাসংশয়, ভাঙ্গাগড়া, চেষ্টাচরিত্র—এ সব পর্দ্দার আড়ালের কথা।

কিন্তু সমকর্ম্মী বা সমধর্ম্মী যাঁহারা তাঁহাদের গুপ্ত গৃহের মোটামুটি খবর খানিকটা জানাই থাকে। বিচিত্র লীলাভঙ্গীর মধ্যে খানিকটা ধারাবাহিকতা, খানিকটা শৃঙ্খলা, খানিকটা কৌশল যে আছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সংক্ষেপতঃ তাহার খানিকটা আভাষ দিয়াই এবার ক্ষান্ত হইব। সাহিত্যরথী বা ওস্তাদদের কাছে এ নূতন কিছু নয়; ছাত্রদের জন্য মন্তব্যগুলি কাজে লাগিতেও পারে।

(১) ভাবপ্রকাশের লঘুতম উপকরণ 'শব্দ'।

শব্দগুলিই বিন্যস্ত হইয়া বাক্য গড়িয়া তোলে। বাক্যের সমষ্টি মিলিয়া মিশিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে।

শব্দ জন্মগ্রহণ করে; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; মৃত্যুবরণ করে। শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে; নূতনের জন্ম দেয় আবার নিজেই হয় ত বিলীন হয়। জনবৃদ্ধির ন্যায় শব্দ সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। বহু শব্দ শব্দাকীর্ণ ভাষার চাপে পড়িয়া প্রাণ হারায়; অনেক শব্দ আবার অমর অক্ষয় হইয়া সজীব থাকে।

ইহার মধ্যে ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুশ্রী থাকিতে বাধ্য। বহু শব্দ শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, ভাবাবেশ আনে, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশে।

শব্দের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। বাংলার শব্দমালার মোট সংখ্যা, সচরাচর ব্যবহৃত শব্দাবলীর অনুপাত ইত্যাদি বিষয় কেহ গবেষণা করিয়াছেন কি না তাহা আমার জানা নাই। তবে ইংরেজীতে ঐরূপ হিসাব মোটামুটি ঃ

	শব্দসংখ্যা
বড় বড় অভিধানে	৫০০০০০
ছোট ছোট চলন্তিকা গোছের অভিধানে	৮৩০০০
সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবহার করে	২০০০০
দৈনন্দিন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়	৮০০০
সাধারণ ৩ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়ে ব্যবহার করে	২০০০ (?)

আমরা সাধারণতঃ ঃ

(১) কথাবার্ত্তায় কতগুলি শব্দ ব্যবহার করি ;

(২) লিখিতে বসিলে আরও বেশী কতগুলি শব্দ ব্যবহার করি ;

(৩) পড়িতে পড়িতে আরও বহু শব্দ জানি ও বুঝি।

মোটামুটি প্রত্যেক দশটী শব্দ কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করার স্থলে **এক শতটী** লেখায় ব্যবহার করি, **এক হাজার** পড়িতে পড়িতে বুঝি।

কথা এই যে, এত বেশী শব্দ জানা সত্ত্বেও ব্যবহার করিবার বেলায় আমরা আড়ষ্ট হই কেন? আমরা যতগুলি শব্দ জানি তাহার একচতুর্থাংশও যদি লেখায় ব্যবহার করিতে পারি তাহা হইলে আমরা বেশ শক্তিশালী লেখক বলিয়া গণ্য হইতে পারি।

এইরূপ শক্তি আয়ত্ত করা উচিত।

(ক) **সুলেখকের প্রচেষ্টাই হইবে শব্দচয়ন।** অভিধান হইতে নহে; সুসাহিত্য হইতে। কবিতা, কাব্যে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই ভাল কবিতা ভাল শব্দের আধার।

কোনও লেখায় বা কাহারও কথাবার্ত্তায় কোনও **নূতন ভাল** শব্দ দেখিলে বা শুনিলে উহা টুকিয়া রাখিতে হয়।

নিজ নিজ নোটবহিতে **"ভাল শব্দ, বাক্য এবং ভাব"** শিরোনামা দিয়া কয়েকটী পাতা ছাড়িয়া রাখা ভাল। তাহা হইলে সুন্দর শব্দচয়নে সুবিধা হইবে।

(খ) **শুধু টুকিয়া রাখিয়া শিখিয়া লইলেই হইবে না। নিজের কথাবার্ত্তায় এবং লেখায় ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।**

(গ) **অস্পষ্ট ধারণা হইলে বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে অভিধান দেখিয়া সুনিশ্চিত হইতে হইবে।**

কারণ, শব্দের অর্থ ও সঙ্গতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে ব্যবহার করিতে সাহস হইবে না।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে।

আমরা ডক্টর জনসনের ইংরেজী বা পণ্ডিতী বাংলা হইতে অনাড়ম্বর অথচ জোরালো ভাষা ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "তাঁহারা নিজেদের অগাধ সংস্কৃত বিদ্যা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার ক্ষীণ শরীরটা প্রকাণ্ডরূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই "পণ্ডিতী বাঙ্গলা" একটা কিম্ভুত-কিমাকার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নমুনা দেখিলে তোমরা না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের লেখা হইতে কিছু নমুনা দিতেছি:

"ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্বাূহরূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরাপশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্বাূহ রূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।"

(প্রবোধ-চন্দ্রিকা)

এই নমুনা হইতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের যে কোনও বাক্য যে কত বেশী মধুর ও সচ্ছল তাহা না বলিলেও চলে।

(২) শব্দ বা বাক্য-বিন্যাস আবার নির্ভর করিবে ভাবের ধারার উপরে।

কষ্টকল্পিত বা ব্যাকরণ-সূত্রযোজিত লেখা আর ভাবাবেশে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রচনার মধ্যে তফাৎ অনেক।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হোরেস (Horace) বলিয়াছেন:

"Seek not for words, seek only
Fact and thought,
And crowding in will come the
words unsought."

অর্থাৎ শব্দের জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। বক্তব্য এবং ভাব থাকিলে ঝাঁকে ঝাঁকে কথা আপনা হইতেই উড়িয়া আসিয়া জুটিবে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) সাহিত্য অর্থে বলেন, উহা শক্তিশালী ভাবধারার 'স্বতঃ স্ফূর্ত্তি (Spontaneous outburst of powerful feelings)।

আমাদের এক চাকরাণীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহার শব্দের পুঁজি অতিশয় কম ; কথা বলেও সে খুব কম। কিন্তু বিষম ঝগড়া বাঁধিলে তাহার শ্লেষ, অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাষা শুনিলে অবাক হইতে হয়! তাহার ভাবাবেগের বাহনও ক্ষিপ্র হইয়া পড়ে!

বাস্তবিক পক্ষে **ভাবের বাহনই ভাষা**। পর্ব্বতোপরি জলরাশির প্রচাপেই নদনদী খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। জলরাশি কমিয়া গেলে বা নিঃশেষ হইলে নদনদীও শুকাইয়া বা মরিয়া যাইতে বাধ্য।

যাঁহার প্রকৃত পক্ষে কিছু বলিবার আছে এবং অন্তরের প্রেরণায় প্রকাশ-ব্যাকুলতা আছে তাঁহার কথা ফুরাইবার নহে ; অভাব হওয়া ত দূরের কথা! যাহার বক্তব্য নাই, যাহার অন্তরে ভাবের অভাব তাহার ধারকরা শব্দচাতুর্য্য এবং কষ্টকল্পিত ব্যাকরণ ঘাঁটা বাক্য-বিন্যাস আমাদের চিত্ত জয় করিতে পারে না।

পারিপার্শ্বিক ঘটনা, পরিস্থিতি বা সমস্যার চিত্র শিল্পীর সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে ; শিল্পী তাহার তুলিকায় আঁকিয়া রাখে, জাকাইয়া তুলে।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন :

"...আরও একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, সে আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে। আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারে মর্ম্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমা-রেখা। জ্ঞানতঃ কোথায়ও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই ; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্ম্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ ; বর্ত্তমানকালে কোন্ পরিবর্ত্তন উপযোগী এবং কোন্‌টার সময় আজও আসে নি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়েছি..."

আমার মতে প্রেরণা দিয়া সংস্কারকের অভ্যুত্থান সুগম করার কৃতিত্ব সাহিত্যিকের, এই হিসাবে সাহিত্যিকও সংস্কারক। সাহিত্যিকদেরও অন্যের হাতে সমস্যা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদায় না লইয়া সমাধানের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদের উঁচু মনের উদার আহ্বান জগতে বিফলে যাইবার কথা নহে।

প্রাকৃতিক শোভা, সামাজিক সমস্যা, পারিবারিক বীভৎসতা, ব্যক্তিগত অত্যাচার—যখনই যাহা ব্যক্তিবিশেষের মনকে আলোড়িত

করিবে সে উহার বর্ণনা, সমাধান, প্রতিকার বা দমনে শতমুখ হইবে —লিখিতে পারিলে তাহার লেখাও তেমনই খরধার হইবে। জগতের ভাবুক শ্রেণীই তাই উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য গঠন করিয়া গিয়াছেন। সমাজ সংস্কারব্রতী ধর্ম্মযাজকেরা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মহামানবেরা, সূক্ষ্মানুভূতিপ্রাণ কবিভাবুকেরা—সকলেরই বাণী সাধারণের কোলাহলের অনেক উর্দ্ধে স্থান পাইয়া আসিয়াছে।

কোরানের ভাষায় * সাগরও যদি কালি হয়, তবু ভাবের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তাহাও নিঃশেষ হইয়া যায়।

মহামানবের আত্মার বাণী, ভাবুকের চিত্তের স্পর্শ লিখিত কথার মধ্যস্থতায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানবের চিত্ত কি করিয়া জয় করে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

মনীষী গ্যেটে বলিয়াছেন, 'National literature now means very little ; the epoch of world literature is at hand'—অর্থাৎ জাতীয় সাহিত্য বলিতে এখন যৎসামান্যই বুঝায় ; বিশ্বসাহিত্যের দিন সমাগতপ্রায়। Churchill সাহেব সেদিন হার্ভার্ডে বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন, 'The Empires of the future are the empires of the mind'—অর্থাৎ ভবিষ্যতের সাম্রাজ্য হইবে মনের সাম্রাজ্য।

বাংলাসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্য্যায়ে উঠিতে চলিয়াছে ; বাঙ্গালীর চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মুক্ত, প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গৌরবের কথা।

---

* লাউ কানাল্ বাহ্‌রু মেদাদাল্ লিকালেমাতে রাব্বি লানাফেদাল্ বাহ্‌রু কাব্‌লা আন্ তান্‌ফাদা কালিমাতো রাব্বি ওলাউ যে'না বেমেছলিহি মাদাদা। —(কোরান)

(৩) ভাবধারার সুবিন্যস্ত প্রকাশই রচনাপারিপাট্য; ইহা কর্ষণসাপেক্ষ।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ভাবধারা প্রবল হইলেও শব্দ-পুঁজি দুর্ব্বল হইলে প্রকাশধারা ব্যাহত অথবা এলোমেলো হইয়া পড়ে।

শব্দগুলি সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বাক্য গঠন করে। বাক্যও সুবিন্যস্ত বা কুবিন্যস্ত হইতে পারে। সাহিত্যিকের ওস্তাদিই এখানে। একই রকম শব্দমালা ব্যাকরণ রক্ষা করিয়াও নানা ভাবে সাজানো যায়। এই নানা ভাবে গঠিত বাক্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ ধরিতে বেশী সময় লাগে না।

আমাদের শব্দচয়নের পরামর্শ তাই বৃথা যাইবার কথা নহে।

বাক্যবিন্যাসের বড় ওস্তাদিই হইল :

(ক) বক্তব্যের গূঢ় কথা বাক্যে শুধু পরিস্ফুটই নহে, প্রকট হইবে।

(খ) বাক্যবিন্যাসের ধারা একই না হইয়া বিভিন্ন হইবে। কখনও ছোট, কখনও বড়, কখনও উক্তি, কখনও প্রশ্ন, কখনও সাধারণ পদবিন্যাস, কখনও উলটপালট করিয়া জোরালো পদবিন্যাস —ইত্যাদি দিয়া বক্তব্যকে আগাইয়া লইয়া চলিতে হইবে। *

---

* হারবার্ট স্পেন্সার এ সম্পর্কে বলেন :

'Now he will be rhythmical and now irregular; here his language will be plain and there ornate; sometimes his sentence will be balanced and at other times unsymmetrical; for a while there will be considerable sameness, and then again great variety. His note of expression

(গ) ছোট বাক্য দিয়া প্যারা আরম্ভ করা ভাল। ভাবের জোরালো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের ভার ও গতি বাড়িবে। প্যারার শেষে বক্তব্যের গূঢ় কথা পরিস্ফুট ও প্রকট হইবে।

ছোট বাক্য অনেক সময়ে গুরুত্ব বুঝাইবার কাজ করে।

(ঘ) প্যারাগ্রাফ বক্তব্যের বিভিন্ন ভাব নির্দ্দেশ করিবে। উহাও দরকার মত ছোট বড় হইবে। বিভিন্ন প্যারায় পূর্ব্বাপরের ভাবের যোগসূত্র বিদ্যমান থাকিবে।

এক একটী ভাবের আরম্ভ ও শেষ নির্দ্দেশ করে বলিয়া প্যারা পাঠকের চক্ষু ও মনকে বিশ্রাম দেয়।

আদালত বা রেজেষ্ট্রি অফিসের আরজী বা দলিলের মত বিরামহীন লম্বা লম্বা লেখা ভীষণ পীড়াদায়ক।

কেবল 'ভাব আসিতেছে না' বা 'কবে আসিবে' ইহা বলিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না।

ভাবুক বা কবিদের অনেকে ভাবের আবেগেই কহিয়া বা রচিয়া যান ইহা সত্য ; কিন্তু ভাবধারার কর্ষণও সম্ভবপর। উহা করা যায় উঁচু মনের সংস্পর্শে আসিয়া ; অন্যের ভাবধারার অনুভূতি নিজ মনে গ্রহণ করিবার প্রয়াস করিয়া।

লিখন-প্রণালীর মধ্য দিয়া আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মনের সংস্পর্শে আসি ; নূতন প্রেরণা পাই ; অনুভূতি তীক্ষ্ণ করি।

---

naturally responding to his state of feeling, there will flow from his pen a composition changing to the same degree that the aspects of his subjects change ; and his work will present to the reader that variety needful to prevent continuous exertion of the same faculties."

সুষ্ঠু বাক্যবিন্যাস উঁচু দরের লেখকদের ব্যবহারের ধারা হইতে শেখা যায় ; ব্যাকরণ হইতে নহে। *

যে যত বেশী সুসাহিত্য পড়িবে বাক্যবিন্যাসের বৈচিত্র্যের তত বেশী পরিচয় পাইবে। তবে কাঁহারও কাঁহারও মনোমত লেখকের রচনার অনুকরণের অভ্যাস আছে।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোন্ বই কতবার পড়িয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কত দূর অনুকরণ করিয়াছিলেন—তাহা হয় ত সকলের জানা নাই। তবে প্রথম জীবনে পরের শেরেস্তায় নকলনবিসী করারও সার্থকতা আছে।

ষ্টিভেন্‌সন (R. L. Stevenson) নোট বই লইয়া পড়িতে বসিতেন। ভাল ভাল শব্দ, বাক্য, ভাব দেখিলেই টুকিয়া লইতেন।

মোটের উপর পরের বহি পড়িতে পড়িতে যখনই দেখা যায়—সুন্দর একটী নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—সুন্দর ভাবে কথাটা বলা

* What has made the rhetoric of sentence structure so difficult to master in the past has been the tendency of authors of text books to treat it as a body of abstract rules to be memorized, instead of as an integral part of the creative process. What we need is not a code, but a real psychology of use ; not many rules but a few principles which will help us to express ourselves with greater clearness and emphasis. We must remember that literature was written long before text books were invented, and that **it is quite possible that one might become a successful writer without ever having seen a rhetoric or memorized a rule.**

Glenn Clark
—(A Manual of the Short Story Art).

হইয়াছে—তখনই থামিয়া ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিয়া মস্তিষ্কস্থ করিয়া লওয়া ভাল। এইরূপ অভ্যাস করিলে সুসাহিত্য শুধু উপভোগ্য হইবে না, উপকারীও হইবে।

যাঁহারা ইহার চেয়েও উদ্যোগী হইতে চান, তাঁহাদের উচিত হৃদয়গ্রাহী রচনা নিজ হাতে বারে বারে নকল করা। লিখিলে বেশী মনে থাকে।

ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :

"এই সময়ে আমি স্পেক্টেটর (Spectator) পত্রিকার এক খণ্ড হঠাৎ দেখিতে পাই। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও ইহার কোনও খণ্ড দেখি নাই। আমি উহা কিনিয়া ফেলি এবং বার বার পড়িতে থাকি। আমি উহা ভারী পছন্দ করি ; উহার লেখার ধারা আমার কাছে খুব উৎকৃষ্ট মনে হয় এবং যতদূর সম্ভব উহার রচনাভঙ্গী অনুকরণ করিবার ইচ্ছা করি।"

এই উদ্দেশ্যে তিনি বার বার অংশবিশেষ পড়িয়া কিছু দিন পরে আবার নিজের ভাষায় উহা দাঁড় করাইতেন। তাহার পরে আসলের সঙ্গে নকলের তফাৎ কত দূর তাহা লক্ষ্য করিয়া আবার কাটছাঁট করিতেন।

ইহাতে তাঁহার শব্দের পুঁজি বাড়িত, রচনাভঙ্গী মার্জ্জিত হইত এবং এমন কি কোথায়ও কোথায়ও আসলের চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনাবিন্যাস হইয়া পড়িত। ইহাতে তাঁহার উৎসাহ বাড়িত এবং ভবিষ্যতে ভাল ইংরেজী লেখক হইবেন বলিয়া উচ্চ আশা পোষণ করিতেন।*

* আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের এবং নূতন লেখক লেখিকাদের

আবার মনে রাখিতে হইবে, ভাবধর্ম্মী কথা অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, কাব্য ছাড়াও 'বিষয়ধর্ম্মী' (factual) রচনাও আছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিস্তর মেহ্‌নতের দরকার।

কোনও 'বিষয়ে' লিখিতে হইলে ঐ সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করা কষ্টসাধ্য।

বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধীয় লেখা শুধু খেয়ালের বশে সম্ভবপর নহে। জ্ঞানের ধারা পূর্ব্বাপর কি হইয়াছে এবং হইয়া

উপকারে আসিবে বলিয়া জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অনুকরণের অভ্যাসের একটা মোটামুটি পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল :

SELF CULTIVATION IN STYLE.

"James Russell Lowell says in his Essay on Chaucer that a poet learns to write, just as a child learns to speak by watching the lips of those who can speak better than he can. It was so with Chaucer. Franklin tells us in his Autobiography that he formed his own style by imitating the Spectators of Addison and Steele. Dr. Johnson says in a passage which is not, but ought to be, familiar to every school boy : 'Whoever wishes to attain an English style, familiar but not coarse, and elegant but not ostentatious, must give his days and nights to the volumes of Addison.' Lamb got his manner from Sir Thomas Browne. Stevenson relates in detail how he taught himself his trade by a multitude of monkey tricks based on a list of authors ranging from Lamb to Hazlitt and from Baudelaire to Obermann. Even Jack London confesses that he

আসিতেছে, কোথায় কোন্ তথ্য পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে, বুঝিতে ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তারপর সুবিন্যস্ত কথা দিয়া অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

যাহারা কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার না করিয়া 'ভাবকবি'দের মত 'খেয়ালী লেখক' বলিয়া পরিচিত হইতে চায় তাহারা অপরকে প্রবঞ্চনা করে—তাহাদের প্রচেষ্টা বৃথা—শুধু তাহাই নহে, উহা অনিষ্টকর।

ভাবপ্রবণ লেখকেরা আমাদের চিত্তকে মোহিত করিতে পারেন

acquired his style by studying modern American magazines and newspapers nineteen hours a day.

"Literature bristles with evidence that other writers have done likewise. The Aeneid is an imitation, a very palpable imitation, of the Iliad and Odyssey. Dante openly proclaims that Virgil was his master. In Paradise Lost, by substituting Satan for Aeneas, Eve for Dido, and Hell for Africa, John Milton produced a parody more impressive than his model, but still a parody. Tennyson confesses that his epic, his King Arthur, consists of faint Homeric echoes. It seems clear that Aeschylus learned from Pindar ; Sophocles from Aeschylus, Euripides from Sophocles ; Racine, Corneille, and Milton from all three.

"'Shakespear himself, the imperial,' says Stevenson, 'proceeds directly from a school.' By judiciously imitating sporting Kyd on the one hand and on the other studying the cadences of 'Marlowe's mighty line,' he learned to steer from grave to gay, from lively to severe, in a fashion which overjoyed all his contemporaries except Greene, who expressed his grief by calling the predatory William

কিন্তু আমাদিগকে জ্ঞানে উন্নত বা সৎপরামর্শদানে উপকৃত করিবার গুরুভার যাঁহারা লইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে শিক্ষক বা উপদেষ্টার যোগ্য হইতে হইবে—জ্ঞানবিকীরণের পূর্ব্বে কষ্ট করিয়া জ্ঞানাহরণ করিতে হইবে।

নিজে লিখি বলিয়াই যে সুলিখিত কথার প্রভাব ব্যক্তিগতভাবে আমি কম অনুভব করি তাহা নহে। অনেক লেখকেরই কথার লালিত্যে সম্মোহিত হইয়া ভাবি, 'শিল্পী, কি মোহিনী জান তুমি! কি মধুর তোমার রচনাভঙ্গী!" চিন্তাশীল অনেক লেখকেরই

'an upstart crow beautified with our feathers.' It was true. It is also true that Wilhelm Tell and Beket remind one in countless ways of Macbeth and Hamlet. Theocritus taught Virgil the art of writing bucolics, Milton the plan of Lycidas, and Tennyson the melodies of Oenone. The influence of Demosthenes is clear enough in the Areopagitica ; and the plan of Burke's Conciliation is essentially the same as that of Cicero's Manilian Law. 'The more I wonder the less I can imagine,' wrote Francis Jeffrey to Thomas B. Macaulay, 'where you picked up that style.' If he had investigated a little more and wondered a little less, he would have found the answer in Demosthenes and Cicero, in Thucydides and Tacitus, in Homer and Dante, in the King James Bible, in Milton, Addison, and Burke. Macaulay's sentence structure has been aped with some success by John Richard Green, John Churton Collins, John Bach McMaster, James B. Angell, and Sir George Otto Trevelyan, not to mention several hundreds of less skillful disciples, while the admirable construction of his framewords and the clearness of his paragraph structures

জ্ঞানবিকীরণের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়া প্রণত হই, বলি, "গুণি, কি গভীর তোমার জ্ঞান, কি অপূর্ব্ব তোমার বুঝাইবার শক্তি!"

এরূপ মনোমুগ্ধকর অনুভূতি আজীবন খুঁজিতেই থাকিব।

have influenced many other imitators, including Francis Parkman and John Fiske. Even Thomas Carlyle confesses that he got his style by imitating his father's speech. Did Irving learn nothing from Addison, Bryant from Wordsworth, Lowell from Tennyson, Whittier from Burns, or Holmes from Pope? Think of Burns's obligations to Spenser, Pope, and Fergusson. Indeed, the only poets I am accustomed to think of, as not being imitators are Homer and Rudyard Kipling. But has not the latter imitated Will Carleton and Bret Harte?.....

"It would be easy to expand this catalogue, but it is needless. The conclusion is irresistible. **The way to learn to write is to use models.**" .....Edwin L. Miller in Notes on Teaching English Composition.

নিবেদনের শেষের কথা

নিবেদনের শেশের কথা *

পরিশেষে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমার দেশবাসী আমার প্রস্তাবিত সংস্কারপ্রণালী যেন পরমতসহিষ্ণু হইয়া বিচার করেন। অন্যান্য গুরুসমাজ-বিধিব্যবস্থা ও বিজ্ঞানালোচনায় আমাকে যে বিচারবিবেচনা সহকারে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্কারপ্রচেষ্টায় তাহা

পরিশেশে আমার শনির্‌বন্‌ধ অনুরোধ আমার দেশবাশি আমার প্‌রশ্‌তাবিত শংশ্‌কারপ্‌রনালি জেন পরমতশহিশ্‌নু হইয়া বিচার করেন। অন্‌ন্যান্‌ন গুরুশমাজ-বিধিব্যবশ্‌থা ও বিগ্‌গানালোচনায় আমাকে জে বিচারবিবেচনা শহকারে অগ্‌রশর হইতে হইয়াছে, বর্‌তমান শংশ্‌কারপ্‌রচেশ্‌টায় তাহা

* (১) নমুনার জন্য শেষের অধ্যায়টী পাশাপাশি উভয় বানানে মুদ্রিত হইল। আমার পাঠকেরা, বিশেষ করিয়া স্নেহের ছাত্রসমাজ, আমার বন্ধুবান্ধবেরা, বিশেষ করিয়া লেখকসম্প্রদায়, আমার পৃষ্ঠপোষকেরা, বিশেষ করিয়া শিক্ষক, অধ্যাপক ও সম্পাদক শ্রেণী, আমার সহযাত্রী হউন আমি আন্তরিকভাবে তাহাই কামনা করিতেছি।

অপেক্ষাও বেশী চিন্তাভাবনা আমাকে করিতে হইয়াছে। কারণ, মাতৃভাষা সকলেরই আদরের বস্তু, গৌরবের সম্পদ; তাহার উপরে উহার শ্রীবৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি যদি এমনিই হইয়া চলে, তবে উহাতে রদবদল করিতে গেলে প্রাণে লাগিবারই কথা।	অপেক্‌খাও বেশি চিন্‌তাভাবনা আমাকে করিতে হইয়াছে। কারন মাত্‌রিভাশা শকলেরই আদরের বশ্‌তু গোউরবের শম্‌পদ; তাহার উপরে উহার শ্‌রিব্‌রিদ্‌ধি ও ক্‌রমোন্‌নতি জদি এমনিই হইয়া চলে তবে উহাতে রদবদল করিতে গেলে প্‌রানে লাগিবারই কথা।
তবে যদি প্রস্তাবিত রদ-বদলে উহা কিছুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া উহার গতি আরও দ্রুত হয়, উহার দোষত্রুটি স্খালিত হয়, উহার সৌষ্ঠব পূর্ণতর হয়, তাহা হইলে আপত্তি	তবে জদি প্‌রশ্‌তাবিত রদ-বদলে উহা কিছুমাত্‌র বাধাপ্‌রাপ্‌ত না হইয়া উহার গতি আরও দ্‌রুত হয় উহার দোশত্‌রুটি শ্‌খালিত হয় উহার শোউশ্‌ঠব পুর্‌নতর হয়, তাহা হইলে আপত্‌তি

(২) লক্ষ্য রাখিতে হইবে:

(ক) ফাউন্‌ড্‌রী হইতে টাইপ না পাওয়ায়, আ-কার (া), ই-কার (ি) ঘটিত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইল না।

(খ) কোনও কোনও স্থলে হসন্ত চিহ্ন (্) দিয়া আবার মাঝে মাঝে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এখনও শব্দের মধ্যভাগে ও শেষে অনেক স্থলে হসন্ত না দিয়াই হসন্তের উচ্চারণ করা হয়। যথা: জন, মন, মুখ, দরকার, নামগুলি।

(গ) নূতন বানানে শব্দ, শব্দসমাবেশ, ভাব ও ভাষা **একেবারে অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। অথচ বানানে মতভেদ, সংশয় বা দ্বিচারণের এতটুকুও অবসর নাই।** মাত্র কয়েকদিন একটু দৃষ্টিকটু লাগিবে।

দূরে থাকুক, ঐরূপ সংস্কার করিয়া লওয়াই প্রগতির লক্ষণ, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মাতৃভাষার এরূপ উন্নতিতে আমি নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান। আমার নিজের বিশ্বাস যদি সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণভাবে দ্বিধাসংশয়হীন না হইত, তাহা হইলে এমন অপ্রীতিকর প্রস্তাব লইয়া জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতাম না।

আমার আন্তরিক সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক কামনা আমার মাতৃ-ভাষা আধুনিক কালোপযোগী হইয়া দাঁড়াক, অপরদের আদর্শ-স্থানীয় বাহন হইয়া উঠুক।

এই জন্যই শুধু প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি না। ইহাকে রূপ দিতেও অগ্রসর হইতেছি। চিঠিপত্র প্রবন্ধাদিতে এই মতে লিখা বহু পূর্ব্ব হইতেই শুরু করিয়া দিয়াছি।

ইহাকে দুঃসাহসিকতা বা

দুরে থাকুক ওইরুপ শংশ্কার করিয়া লওয়াই প্রগতির লক্‌খন বুদ্‌ধিমত্‌তার পরিচয়। ব্যক্‌তিগত ভাবে আমার মাত্‌রিভাশার এরুপ উন্‌নতিতে আমি নিজে শম্‌পুর্‌ন বিশ্‌শাশবান। আমার নিজের বিশ্‌শাশ জদি শুদ্‌রিড়্‌হ ও শম্‌পুর্‌নভাবে দিধাশংশয়হিন না হইত তাহা হইলে এমন অপ্‌রিতিকর প্‌রশ্‌তাব লইয়া জনশমাজের শম্‌মুখে উপশ্‌থিত হইতাম না।

আমার আন্‌তরিক শদিচ্‌ছা ও ওইকান্‌তিক কামনা আমার মাত্‌রি-ভাশা আধুনিক কালোপজোগি হইয়া দাড়াক, অপরদের আদর্‌শ শ্‌খানিয় বাহন হইয়া উঠুক।

এই জন্‌নই শুধু প্‌রশ্‌তাব করিয়াই খান্‌ত হইতেছি না। ইহাকে রুপ দিতেও অগ্‌রশর হইতেছি। চিঠিপত্‌র প্‌রবন্‌ধাদিতে এই মতে লিখা বহু পুর্‌ব হইতেই শুরু করিয়া দিয়াছি।

ইহাকে দুশ্‌শাহশিকতা বা

ঔদ্ধত্য বলিবার লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু বহু সৎকার্য্য শুধু প্রস্তাব ও আলোচনায়ই পর্য্যবসিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া "শুভস্য শীঘ্রম্" মন্ত্রের শরণাপন্ন হইতেছি।

নিছক নূতনত্বের অভিযোগের অবকাশ নাই; পূর্ণ উদ্যম ও প্রচেষ্টার কৃতিত্বের সামান্য দাবীর কথা থাকিতে পারে মাত্র। আমি মনে করি, এ সৌভাগ্য আমার হইল; কিন্তু বহু সাহিত্যসেবী ও পণ্ডিতের অনুরূপ অভিমত আমি এ আলোচনার বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছি যে, সংস্কারের স্বপক্ষে বুদ্ধিমান জনগণের অনুভূতি জাগিয়াই আছে।

ভাষাবিদ শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বহুদিন পূর্ব্বেই মন্তব্য করিয়াছিলেন:

"প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম ও

ওউদ্‌ধত্‌ত বলিবার লোকের অভাব হইবে না। কিন্‌তু বহু শতকার্‌জ শুধু পর্‌শ্‌তাব ও আলোচনায়ই পর্‌জবশিত হইয়া মিলাইয়া জাইতেছে দেখিয়া "শুভশ্‌শ শিঘ্‌রম" মন্‌ত্রের শরনাপন্‌ন হইতেছি।

নিছক নুতনত্‌তের অভিজোগের অবকাশ নাই; পুর্‌ন উদ্‌দম ও পর্‌চেশ্‌টার কৃরিতিত্‌তের শামান্‌ন দাবির কথা থাকিতে পারে মাত্‌র। আমি মনে করি, এ শোউভাগ্‌গ আমার হইল; কিন্‌তু বহু শাহিত্‌তশেবি ও পন্‌ডিতের অনুরুপ অভিমত আমি এ আলোচনার বহু শ্‌থলে উধ্‌রিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছি জে, শংশ্‌কারের শপক্‌খে বুদ্‌ধিমান জনগনের অনুভুতি জাগিয়াই আছে।

ভাশাবিদ শ্‌রদ্‌ধেয় ডক্‌টর শহিদুল্‌লাহ্ বহু দিন পুর্‌বেই মন্‌তব্‌ব করিয়াছিলেন:

"প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম ও

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলাভাষার অনেকটা সংস্কার হইয়াছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক্ দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচেনি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতে দুটো ব বাংলায় একাকার হয়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে; তিনটে শ ষ স, দু'টো ণ ন, দু'টো জ য, এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নজীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো সাহসে কুলোয় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি?"

সেই কথাগুলিই গুছাইয়া বলিয়াছি বলিয়া আমার অপরাধ হইয়াছে নাকি?

তিনি আরও বলেন, "খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলাভাষার অনেকটা সংস্কার হইয়াছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচেনি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতে দুটো ব বাংলায় একাকার হয়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে; তিনটে শ ষ স, দু'টো ণ ন, দু'টো জ য, এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নজীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো সাহসে কুলোয় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি?"

সেই কথাগুলিই গুছাইয়া বলিয়াছি বলিয়া আমার অপরাধ হইয়াছে নাকি?

তিনি আরও বলেন, "খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে।

যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হয়ে আছে। এতে যে খুট-আখুরে ছেলেমেয়ের প্রাণান্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজী, ফরাসী আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য ভাষা হ'য়ে উঠবে, তখন হয় ত, লাটিন হরফ চালাতে হ'বে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উাচত।"

আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি বলিয়াই কি অন্যায় কারিয়াছি?

বহু লোকের হয় ত এাদকে মনোযোগ দিবার সময় ও সুযোগ হয় নাই। আমার এই আলোচনা তাহদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলে হয় ত ইহা নানা দিক দিয়া পূর্ণতর ও সফলতর হইবে।

কথা হইবে, আমাদের কোমলমতি শিশুদের অন্য বহুবিধ অকেজো বিষয়ও ত বিদেশী

যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হয়ে আছে। এতে যে খুট-আখুরে ছেলেমেয়ের প্রাণান্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজী, ফরাসী আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য ভাষা হ'য়ে উঠবে, তখন হয় ত, লাটিন হরফ চালাতে হবে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

আমি এই ব্যবশ্‌থা করিয়াছি বলিয়াই কি অন্‌ন্যায় করিয়াছি?

বহু লোকের হয় ত এদিকে মনোজোগ দিবার শময় ও শুজোগ হয় নাই। আমার এই আলোচনা তাহাদের দ্‌রিশ্‌টি এদিকে আকর্‌শন করিলে হয় ত ইহা নানা দিক দিয়া পুর্‌নতর ও শফলতর হইবে।

কথা হইবে, আমাদের কোমলমতি শিশুদের অন্‌ন বহু-বিধ অকেজো বিশয়ও ত বিদেশি

শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে শিখানো হইতেছে! অথচ শুধু বাংলা ব্যাকরণ বা বানান লইয়া মাথা-ব্যথারই এত কারণ হইল কিসে?

আমার নিবেদন, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষত্রুটি আমাদের অবিদিত নাই। সংস্কারেরও আশু প্রয়োজন রহিয়াছে। সেদিকে অনেকে মনোযোগ দিয়াছেন এবং দিবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার বক্তব্যও সময় মত নিবেদন করিব। তবে **শিক্ষার যাহা বাহন** তাহার সংস্কার প্রচেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য।

অন্য ভাষায়ও দোষত্রুটী রহিয়াছে এ কথা অনেকে জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকেন। এ কথা ত আমি সকল সময়ই স্বীকার করিয়া আসিতেছি; তবে এই জন্য আমাদের কোনও কিছুই করার দরকার নাই এ কেমন কথা!

শিক্‌খাপ্‌রনালির প্‌রভাবে শিখানো হইতেছে! অথচ শুধু বাংলা ব্যকরন বা বানান লইয়া মাথা-ব্যথারই এত কারন হইল কিশে?

আমার নিবেদন, আমাদের শিক্‌খাপ্‌রনালির দোশত্‌রুটি আমাদের অবিদিত নাই। শংশ্‌কারেরও আশু প্‌রয়োজন রহিয়াছে। শেদিকে অনেকে মনোজোগ দিয়াছেন এবং দিবেন। ব্যক্‌তিগতভাবে আমার বক্‌তব্‌বও শময় মত নিবেদন করিব। তবে **শিক্‌খার জাহা বাহন** তাহার শংশ্‌কার প্‌রচেশ্‌টাই শর্‌বাগ্‌রে করা কর্‌তব্‌ব।

অন্‌ন ভাশায়ও দোশত্‌রুটি রহিয়াছে এ কথা অনেকে জোর গলায় প্‌রচার করিয়া থাকেন। এ কথা ত আমি শকল শময়ই শিকার করিয়া আশিতেছি; তবে এই জন্‌ন আমাদের কোনও কিছুই করার দরকার নাই এ কেমন কথা!

অন্যের উঠানেও জঙ্গল আছে বলিয়া আমাদের উঠান পরিষ্কার করিব না এ কেমন মনোভাব ?

আমরাই সর্ব্বাগ্রে সংস্কার করিয়া জগতকে দেখাইয়া দেই না কেন, প্রাচ্য মনই এদিকে সকলের অগ্রণী হইল ? আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি অপরে আমাদের অনুসরণ করে আমরা পথপ্রদর্শকের কৃতিত্ব পাইব ; না করে, আমরাই একা সুবিধাভোগ করিতে থাকিব।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের মধ্যে প্রচলিত বাংলার অক্ষর-বাহুল্য এবং বানান জটিলতার দরুণ যাহারা আরবী বা রোমান বা অন্য কোনও লিপিমালা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী তাহাদিগকে বলিব, আমার প্রস্তাবিত সংস্কারের পরে জগতে এমন কোনও লিপিকৌশল থাকিবে না যাহা আমাদের উপরে

অন্নের উঠানেও জংগল আছে বলিয়া আমাদের উঠান পরিশকার করিব না এ কেমন মনোভাব ?

আমরাই শর্ববাগ্রে শংশ্কার করিয়া জগতকে দেখাইয়া দেই না কেন প্রাচ্চ মনই এদিকে শকলের অগ্রনি হইল ? আমাদের আদরশে অনুপ্রানিত হইয়া জদি অপরে আমাদের অনুশরন করে আমরা পথপ্রদরশকের কৃরিতিত্ত পাইব ; না করে, আমরাই একা শুবিধাভোগ করিতে থাকিব।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের মধ্ধে প্রচলিত বাংলার অক্খর-বাহুল্ল এবং বানান জটিলতার দরুন জাহারা আরবি বা রোমান বা অন্ন কোনও লিপিমালা প্রবরতনের পক্খপাতি তাহাদিগকে বলিব আমার প্রশ্তাবিত শংশ্কারের পরে জগতে এমন কোনও লিপিকৌশল থাকিবে না জাহা আমাদের উপরে

শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারিবে।

আরবী, ফারসী, উর্দ্দু লিপি-মালার বর্ণবাহুল্য, অক্ষরের উপরে নীচে ও পাশে বিন্দু-বাহুল্য, রূপান্তর বিভ্রাট, টাইপপ্রমাদ এত বেশী যে তুর্কীরা ইচ্ছা করিয়াই উহা বর্জ্জন করিয়াছেন।

রোমান লিপিমালা গ্রহণ করিয়া ইংরেজী ভাষা বহু সুবিধা ভোগ করিতেছে। কিন্তু এখনও ইংরেজী টাইপ ও লিখনের বিভিন্নতা, স্মল ও ক্যাপিটাল লেটারের অনাবশ্যক বিভ্রাট, স্বরবর্ণের উচ্চারণের উদ্ভটতা (Man, far, mast, mane ; fig, fire, first ; put, but, pure), ব্যঞ্জনেরও উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (cat, cite ; go, gist, bang, sun, sure ; revise), অনুচ্চারিত বর্ণ-বিন্যাস, calm, though, psalm), অনাবশ্যক দ্বিত্ব

শ্‌রেশ্‌ঠত্‌ত দাবি করিতে পারিবে।

আরবি ফারছি উর্‌দু লিপি-মালার বর্‌নবাহুল্‌ল, অক্‌খরের উপরে নিচে ও পাশে বিন্‌দু-বাহুল্‌ল, রুপান্‌তর বিভ্‌রাট, টাইপপ্‌রমাদ এত বেশি জে তুর্‌কিরা ইচ্‌ছা করিয়াই উহা বর্‌জন করিয়াছেন।

রোমান লিপিমালা গ্‌রহন করিয়া ইংরেজি ভাশা বহু শুবিধা ভোগ করিতেছে। কিন্‌তু এখনও ইংরেজি টাইপ ও লিখনের বিভিন্‌নতা, শ্‌মল ও ক্যাপিটাল লেটারের অনাবশ্‌শক বিভ্‌রাট, শরবর্‌নের উচ্‌চারনের উদ্‌ভটতা (Man, far, mast, mane ; fig, fire, first ; put, but, pure), ব্যান্‌জনেরও উচ্‌চারন বইচিত্‌র (cat, cite ; go, gist, bang ; sun. sure, revise), অনুচ্‌চারিত বর্‌ন-বিন্‌ন্যাশ (calm, though, psalm), অনাবশ্‌শক দিত্‌ত

করণের অভ্যাস (Running, travelled), এত বেশী যে অভিধানে প্রায় সকল কথার পরেই উহার উচ্চারণ-বিশ্লেষণ করিয়া না দেখাইলে উপায় নাই। **অথচ প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানানপদ্ধতিতে উপরোক্ত দোষত্রুটির কিছুমাত্র থাকিবে না। অভিধানে উচ্চারণ নির্দ্দেশের কোনও দরকারই হইবে না।** বাংলায় পুট, বাট, পিওর, পিউনি, দো, কাম ইত্যাদিতে আর কোনও গণ্ডগোলের অবকাশই থাকিবে না।

তাই এখনও নিছক স্বপ্ন বলিয়া মনে হইলেও জগতের অন্য সকলকে ভবিষ্যতে আমাদেরই বর্ণমালা ও বানানপদ্ধতি গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণই বা আমরা করিব না কেন ?

বিরুদ্ধ সমালোচনাও যে

করনের অভ্‌ভ্যাস (Running, travelled), এত বেশি জে অভিধানে প্‌রায় শকল কথার পরেই উহার উচ্‌চারন-বিশ্‌লেশন করিয়া না দেখাইলে উপায় নাই। **অথচ প্‌রশ্‌তাবিত বর্‌নমালা ও বানানপদ্‌ধতিতে উপরোক্‌ত দোশত্‌রুটির কিছুমাত্‌র থাকিবে না। অভিধানে উচ্‌চারন নির্‌দেশের কোনও দরকারই হইবে না।** বাংলায় পুট, বাট, পিওর, পিউনি, দো, কাম ইত্‌ত্যাদিতে আর কোনও গন্‌ডোগোলের অবকাশই থাকিবে না।

তাই এখনও নিছক শপ্‌ন বলিয়া মনে হইলেও জগতের অন্‌ন শকলকে ভবিশ্‌শতে আমাদেরই বর্‌নমালা ও বানান পদ্‌ধতি গ্‌রহন করিতে আমন্‌ত্‌রনই বা আমরা করিব না কেন ?

বিরুদ্‌ধ শমালোচনাও জে

হইবেই তাহা স্বীকার্য্য। হওয়াই উচিত।

অমর মনীষী রবীন্দ্রনাথেরই আবেদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমস্যা সমাধানের সাধু প্রচেষ্টা করিয়াছেন। অথচ ইহারই বিরুদ্ধতা করিতে কেহ কেহ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন।

বিরুদ্ধবাদিদের যুক্তির বিচার করিতে গিয়াই আমি ঐ আলোচনা সম্পকিত বাদানুবাদের ধারা তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

দুঃখের বিষয়, ইহাতে যুক্তি-তর্ক অপেক্ষা শ্লেষ, কটূক্তি, নিছক **পরিবর্ত্তনবিরোধিতাই** বেশী প্রকট হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের একটা উক্তি এইরূপ যে, আমাদের যেমন সহিয়া গিয়াছে, সকলেরই এইরূপ

হইবেই তাহা শিকার্‌জ। হওয়াই উচিত।

অমর মনিশি রবিন্‌দ্রনাথেরই আবেদনে কলিকাতা বিশ্‌শবিদ্‌দ্যালয় বানান শমশ্‌শ্যা শমাধানের শাধু প্‌রচেশ্‌টা করিয়াছেন। অথচ ইহারই বিরুদ্‌ধতা করিতে কেহ কেহ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন।

বিরুদ্‌ধবাদিদের জুক্‌তির বিচার করিতে গিয়াই আমি ওই আলোচনা শম্‌পর্‌কিত বাদানুবাদের ধারা তন্‌ন তন্‌ন করিয়া পর্‌জালোচনা করিয়াছি।

দুখ্‌খের বিশয়, ইহাতে জুকতি-তর্‌ক অপেক্‌খা শ্‌লেশ, কটুক্‌তি, নিছক **পরিবর্‌তনবিরোধিতাই** বেশি প্‌রকট হইয়াছে।

বলা বাহুল্‌ল, পরিবর্‌তন-বিরোধিদের একটি উক্‌তি এইরুপ জে, আমাদের জেমন শহিয়া গিয়াছে, শকলেরই এইরপ

সহিয়া যাইবে। বানানের গোলমাল এত বড় কিছু নয় যাহার জন্য মাথা ঘামাইতে হইবে।

আমার নিবেদন, এ কথা মোটেই সত্য নহে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বানান ভুল ধরিয়া তাঁহাকেও পত্রাঘাত করা হইয়াছে। তিনিও স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই যে, তিনি উহাতে কাঁচা।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নামটি লইয়া বহু বাদবিতণ্ডা হয় এবং 'শরচ্চন্দ্র' না লিখিয়া 'শরৎচন্দ্র' লিখেন বলিয়া তিনি ভুলের দায়ে অভিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, তিনি কিছুকাল ভীতচিত্তে পণ্ডিতদের ফতোয়া মানিয়া লইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, সগৌরবে ইহার পর হইতে আজীবন 'শরৎচন্দ্র'ই রহিয়া গেলেন।

শহিয়া জাইবে। বানানের গোলমাল এত বড় কিছু নয় জাহার জন্‌ন মাথা ঘামাইতে হইবে।

আমার নিবেদন, এ কথা মোটেই শত্‌ত নহে। শয়ং রবিন্‌দ্‌রনাথের বানান ভুল করিয়া তাহাকেও পত্‌রাঘাত করা হইয়াছে। তিনিও শিকার করিতে লজ্‌জাবোধ করেন নাই জে তিনি উহাতে কাচা।

অমর কথাশিল্‌পি শরতচন্‌দ্রের নামটি লইয়া বহু বাদবিতন্‌ডা হয় এবং "শরচ্চন্দ্র" না লিখিয়া "শরৎচন্দ্র" লিখেন বলিয়া তিনি ভুলের দায়ে অভিজুক্‌ত হন। বলা বাহুল্‌ল তিনি কিছুকাল ভিতচিত্‌তে পন্‌ডিতদের ফতোয়া মানিয়া লইলেও শেশ পর্জন্‌ত উহা বরদাশ্‌ত করিতে পারেন নাই, শগোউরবে ইহার পর হইতে আজিবন "শরৎচন্দ্রই" রহিয়া গেলেন।

শুদ্ধ ভাষায় 'শরচ্চন্দ্র' লিখিলে দেশবাসী তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন, "বাস্তবিক আমাদের যে বানান তাহা এক মুঠা লোকের জন্য; দেশের আপামর সাধারণ তাহা এখন মানে না, আগেও মানিত না। যদি বিশ্বাস না হয়, যে কোন পুরাণ পুঁথি বা আদালতের নথি কিংবা ডাকঘরের চিঠির বাক্স সার্চ্চ করিয়া দেখ। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হইলে যে এখন পাঁচ বছর বাঙ্গলা শিখিয়াও বানান ভুল করিয়া ফেলে. সে দু' এক মাসে বানান শিখিতে পারিবে।"

আমার দাবীও তাই।

অনেকেরই বলিতে লজ্জা বোধ হইবে না যে, মুদ্রিত পুস্তকের বানান ভুল ছাপাখানার উপর চাপানো এবং হাতে

শুদ্‌ধ ভাশায় "শরচ্চন্দ্র" লিখিলে দেশবাশি তাহাকে শহশা চিনিয়া উঠিতে পারিবে কিনা শন্‌দেহ।

ডক্‌টর শহিদুল্‌লাহ্ বলেন, "বাস্তবিক আমাদের যে বানান তাহা এক মুঠা লোকের জন্য; দেশের আপামর সাধারণ তাহা এখন মানে না, আগেও মানিত না। যদি বিশ্বাস না হয়, যে কোন পুরাণ পুঁথি বা আদালতের নথি কিংবা ডাকঘরের চিঠির বাক্স সার্চ্চ করিয়া দেখ। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হইলে যে এখন যে পাঁচ বছর বাঙ্গলা শিখিয়াও বানান ভুল করিয়া ফেলে, সে দু' এক মাসে বানান শিখিতে পারিবে।"

আমার দাবিও তাই।

অনেকেরই বলিতে লজ্‌জা বোধ হইবে না জে মুদ্‌রিত পুশ্‌তকের বানান ভুল ছাপাখানার উপর চাপানো এবং হাতে

অস্পষ্ট করিয়া লিখা যায় বলিয়া আমরা অনেক সময়ে অব্যাহতি পাই।

এই পুস্তিকাখানি লিখিতেই যে কত সময় অভিধান লইয়া ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং তাহা সত্ত্বেও যে ইহাতে ভুল থাকিবারই কথা ইহা দুঃখের বিষয় হইলেও আমাকে স্বীকার করিতেই হইতেছে।

এই পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে 'সুবিধা অসুবিধা' শীর্ষক আলোচনায় বহু সাহিত্যিক, লেখক, ছাত্র দ্বারা উপস্থাপিত আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে আপত্তি খণ্ডন করিতে পারি নাই তাহার দরুণ যেখানে দরকার সেখানে প্রস্তাবই সংশোধিত করিয়া ফেলিয়াছি।

ভবিষ্যতে আপত্তি অভিযোগ উঠিলে তাহাও এইরূপভাবে বিবেচিত এবং আলোচিত হইবে।

অশ্‌পশ্‌ট করিয়া লিখা জায় বলিয়া আমরা অনেক শময়ে অবুব্যহতি পাই।

এই পুশ্‌তিকাখানি লিখিতেই জে কত শময় অভিধান লইয়া ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং তাহা শত্‌তেও জে ইহাতে ভুল থাকিবারই কথা ইহা দুখ্‌খের বিশয় হইলেও আমাকে শিকার করিতেই হইতেছে।

এই পুশ্‌তকের শপ্‌তম অধ্‌ধায়ে 'শুবিধা অশুবিধা' শির্‌শক আলোচনায় বহু শাহিত্‌তিক লেখক ছাত্‌র দারা উপশ্‌থাপিত আপত্‌তি খন্‌ডন করিবার চেশ্‌টা করিয়াছি। জে আপত্‌তি খন্‌ডন করিতে পারি নাই তাহার দরুন জেখানে দরকার শেখানে প্‌রশ্‌তাবই শংশোধিত করিয়া ফেলিয়াছি।

ভবিশ্‌শতে আপত্‌তি অভিজোগ উঠিলে তাহাও এইরুপভাবে বিবেচিত এবং আলোচিত হইবে।

সাহিত্যে আমার যোগ্যতা যতটুকু থাকুক আর নাই থাকুক জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী হিসাবে মাতৃ-ভাষার অনুরক্ত ভক্ত হিসাবে আমি যাহা ভাল মনে করি তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। বস্তুতঃ আমার এই **সংস্কার-প্রচেষ্টাও সংস্কারসাপেক্ষ।** এই প্রচেষ্টার মূলে **জোর করিয়া চালাইবার** ঔদ্ধত্য নাই। আছে শুধু আমার দেশবাসীর **যৌক্তিকতায়** বিশ্বাস, উঁহাদের **সত্যপ্রীতি** ও **সত্যদৃষ্টিতে** আশ্বাস, উঁহাদের **সহানুভূতি** ও **সহায়তার** প্রত্যাশা।

অসংখ্য সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সহানুভূতিশীল **সহযোগী** ও **সহযাত্রীর** একেবারে অভাব হইবে এ আশঙ্কা আমার করিবার কারণ হয় নাই।

আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

শাহিত্‌তে আমার জোগ্‌গতা জতটুকু থাকুক আর নাই থাকুক গ্যানপ্‌রচারে ব্‌রতি হিশাবে মাত্‌রি-ভাশার অনুরক্‌ত ভক্‌ত হিশাবে আমি জাহা ভাল মনে করি তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। বশ্‌তুত আমার এই **শংশ্‌কার প্‌রচেশ্‌টাও শংশ্‌কারশাপেক্‌খ।** এই প্‌রচেশ্‌টার মুলে **জোর করিয়া চালাইবার** ওউদ্‌ধত্‌ত নাই। আছে শুধু আমার দেশবাশির **জোউক্‌তিকতায়** বিশ্‌শাশ, উহাদের **শত্‌ত প্‌রিতি** ও **শত্‌তদ্‌রিশ্‌টিতে** আশ্‌শাশ, উহাদের **শহানুভুতি** ও **শহায়তার** প্‌রত্‌ত্যাশা।

অশংখ শাহিত্‌তশেবি ও শাহিত্‌তের প্‌রিশ্‌ঠপোশকদের মধ্‌ধে শহানুভুতিশিল **শহজোগি** ও **শহজাত্‌রির** একেবারে অভাব হইবে এ আশংকা আমার করিবার কারন হয় নাই।

আজ বিশ্‌শকবি রবিন্‌দ্‌রনাথ

বাঁচিয়া নাই। থাকিলে, এই প্রস্তাব লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতাম। তিনি যে এই দিকে কত বড় উৎসাহী ছিলেন তাহা প্রতীয়মান হইবে তাঁহার একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নের মন্তব্য হইতে :

"সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে **যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয়** সেখানেই সেটা **করাই কর্ত্তব্য। তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়।** এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের **অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার** প্রতি সম্মান করতে যাওয়া **দুর্ব্বলতা।** যেখানে তাঁদের

বাচিয়া নাই। থাকিলে এই পৃরশ্তাব লইয়া তাহার শমিপে উপশ্থিত হইয়া তাগার আশিরবাদ ভিকৃখা করিভাম। তিনি জে এই দিকে কত বড় উতশাহি ছিলেন তাহা পৃরতিয়মান হইবে তাহার একখানি পতৃর হইতে উধৃরিত নিম্নের মনতব্ব হইতে ঃ

"সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে **যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয়** সেখানে সেটা **করাই কর্ত্তব্য। তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়।** এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের **অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার** প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্ব্বলতা। যেখানে তাঁদের

অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। **অন্যত্র নয়।** বানান সংস্কার সমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ব বর্জ্জনের যে বিধান দিয়েছেন সে জন্য **নবজাত ও অজাত** প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।"

আমারও **প্রধান** উদ্দেশ্য এই **নবজাত ও অজাত** প্রজাবর্গের কল্যাণ। ব্যাকরণকে আমি 'মারি' নাই। উহাকে সরল, সহজ দিকনির্ণয়ের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার উপায় দেখাইয়াছি মাত্র।

অযথা **পরিবর্ত্তনবিরোধিতা** বা নিছক **অভ্যাস** বা **আচারনিষ্ঠতার** বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার এবং নূতন পথে পা বাড়াইবার সাহস বা প্ররোচনা আমি **তরুণ তরুণীদেরই** দিয়া

অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। **অন্যত্র নয়।** বানান সংস্কার সমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ব বর্জ্জনের যে বিধান দিয়েছেন সে জন্য **নবজাত ও অজাত** প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।"

আমারও **প্রধান** উদ্‌দেশ্‌শ এই **নবজাত ও অজাত** প্‌রজাবর্‌গের কল্‌ল্যন। ব্যকরনকে আমি 'মারি' নাই। উহাকে শরল শহজ দিকনির্‌নয়ের জন্‌ত্র হিশাবে ব্যবহার করিবার উপায় দেখাইয়াছি মাত্‌র।

অজথা **পরিবর্‌তনবিরোধিতা** বা নিছক **অভ্‌ভ্যাশ** বা **আচারনিশ্‌ঠতার** বিরুদ্‌ধে দাড়াইবার এবং নূতন পথে পা বাড়াইবার **শাহশ** বা প্‌ররোচনা আমি **তরুন তরুনিদেরই** দিয়া

থাকি। কারণ, **তারুণ্যের ধর্ম্মই গতিশীলতা**। পিতা-মাতা, গুরুজন প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্যের উদ্যমহ্রাস বা গতি-মান্দ্যের দরুণ নূতন পথের বাধা-কণ্টক, ভূত-প্রেত ইত্যাদির কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া উহাদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সদুদ্দেশ্যে **সৎসাহসে ভর করিয়া পথে নামিলেই** উঁহারা **স্নেহপরবশ** হইয়া **সহায়তা** না করিয়া পারিবেন না।

আজ এই পুস্তিকার মধ্যস্থতায় বাংলা—আসাম—বিহার-উড়িষ্যার বিরাট ছাত্র সমাজকে আমার সহায়, বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সহযাত্রী হইতে বিশেষ করিয়া আমন্ত্রণ করিতেছি। তাহারা যেন চিঠিপত্র, কবিতা-প্রবন্ধে নূতন পথের প্রদর্শক হয়। শিক্ষা

থাকি। কারন **তার্‌ুন্‌নের ধর্‌মই গতিশিলতা**। পিতা-মাতা গুরুজন প্‌রোউড়হত্‌ত বা বার্‌ধক্‌কের উদ্‌দমহ্‌রাশ বা গতি-মান্‌দের দরুন নুতন পথের বাধা-কন্‌টক, ভুতপ্‌রেত ইত্‌ত্যাদির কল্‌পিত চিত্‌র অংকিত করিয়া উহাদিগকে শংকিত করিয়া তুলিবার চেশ্‌টা করিতে পারেন, কিনতু তাহারা শদুদ্‌দেশ্‌শে **শত্‌-শাহশে ভর করিয়া পথে নামিলেই** উহারা **শ্‌নেহপরবশ** হইয়া **শহায়তা না করিয়া পারিবেন না**।

আজ এই পুশ্‌তিকার মধ্‌ধশ্‌থ-তায় বাংলা — আশাম — বিহার উড়িশ্‌শ্যার বিরাট ছাতর শমাজকে আমার শহায় বন্‌ধু এবং প্‌রিশ্‌ঠ-পোশক হিশাবে শহজাত্‌রি হইতে বিশেশ করিয়া আমন্‌ত্‌রন করিতেছি। তাহারা জেন চিঠিপত্‌র কবিতা-প্‌রবন্‌ধে নুতন পথের প্‌রদর্‌শক হয়। শিক্‌খা

বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন নূতনকে মানিয়া না লন ততদিন কেবল পরীক্ষার খাতায় ইহাকে বাদ দিয়া চলিলেই হইবে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বিভাগ বলিতে অনেকে কতগুলি দালান বা দফতরের সমষ্টি বুঝিতে পারেন, উঁহাদের পশ্চাতে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে অযথা বিরুদ্ধবাদী বা অনর্থক প্রতিক্রিয়াশীল মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি এবং বুঝি তাঁহারা ছাত্রদেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শুভার্থী নিতান্তই আপনজন।

তাই ছাত্রেরা যদি বলে, 'আমাদের কষ্ট দেখুন; আমাদের আরও ছোট্ট ছোট্ট ভাইবোনদের মাথা ঘুলিয়েও যদি পুরাতনের মর্য্যাদা রক্ষা করতে চান, করুন—নইলে নূতন সহজ সরল পথে আমাদের চলতে দিন,' তাহা হইলে তাহাদের ন্যায্য

বিভাগ বা বিশ্‌শবিদ্‌দ্যালয় জতদিন নুতনকে মানিয়া না লন ততদিন কেবল পরিক্‌থার খাতায় ইহাকে বাদ দিয়া চলিলেই হইবে।

তবে বিশ্‌শবিদ্‌দ্যালয় বা শিক্‌খা বিভাগ বলিতে অনেকে কতগুলি দালান বা দফ্‌তরের শমশ্‌টি বুঝিতে পারেন, উঁহাদের পশ্‌চাতে জাহারা আছেন তাহা-দিগকে অজথা বিরুদ্‌ধবাদি বা অনর্‌থক প্‌রতিক্‌রিয়াশিল মনে করিতে পারেন, কিন্‌তু আমরা জানি এবং বুঝি তাহারা ছাত্‌র-দেরই হিতাকাংখি এবং শুভারথি নিতান্‌তই আপনজন।

তাই ছাত্‌রেরা জদি বলে, আমাদের কশ্‌টো দেখুন আমাদের আরও ছোট্‌টো ছোট্‌টো ভাইবোনদের মাথা ঘুলিয়েও জদি পুরাতনের মর্‌জাদা রক্‌খা করতে চান, করুন — নইলে নতুন শহজ শরল পথে আমাদের চলতে দিন, তাহা হইলে তাহাদের ন্যাজ্জ

দাবী, করুণ মিনতি উঁহারা
মানিয়া লইতে শুধু বাধ্য হইবেন
এমন নহে—উঁহাকে আশীর্ব্বাদ
করিবেন।

দাবি করুন মিনতি উঁহারা
মানিয়া লইতে শুধু বাধ্য হইবেন
এমন নহে—উহাকে আশির্‌বাদ
করিবেন।